স্বামী প্রভানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ
হাওড়া - ৭১১২০২

প্রকাশক :
স্বামী স্মরণানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া – ৭১১২০২

১৩ এপ্রিল ২০২৩
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
12 M

মূল্য : ২০ টাকা

মুদ্রক :
সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে পি কুমার স্ট্রীট
বালি, হাওড়া – ৭১১২০১

স্বামী প্রভানন্দ

১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনস্তত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে চলেছে এক তরুণ। ওই পর্যায়ে তার বিশেষ পত্রটি ছিল অ্যাডভান্সড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি। তখন স্নাতকোত্তর মনস্তত্ত্বের ক্লাস নিতেন রাশিবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান স্বনামধন্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু কুমার বসু। পড়াশুনায় খুব মেধাবী এবং নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্যে এই তরুণটি বরাবর অধ্যাপক বসুর অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিল। অধ্যাপক বসুর প্রতি সেই তরুণ ছাত্রটিও ছিল গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক পূর্ণেন্দু কুমার বসু শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঐ তরুণ ছাত্রটি, "আমাদের মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কয়েকদিন আগে ডঃ বসু আমাকে তলব করলেন এবং আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, তোমাকে রিসার্চ স্কলারশিপ দেব ভাবছি। আমি বলে রেখেছি, অফিস থেকে ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়ে যাও। উত্তরে আমি ইতস্তত করছি দেখে তিনি যেন বিস্মিত হলেন। ভিতরের কথা, যথা শীঘ্র সম্ভব পড়াশোনা শেষ করে আমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। সেজন্য বয়স-সীমাও ছিল বিবেচ্য। ...আমি বললাম, স্যার আমাকে সাতটা দিন সময় দিন। তিনি বিরক্ত হলেন। আমি মহা ফাঁপড়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে ঘোষিত হল, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্বের যৌথ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছি। আমার সত্যকারের অভিভাবক ছিলেন স্বামী প্রেমেশানন্দজী এবং সেই সঙ্গে আমার দায়বদ্ধতা ছিল স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে। যাই হোক, সাতদিন পরে ডঃ বসুকে আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে নিবেদন করলাম যে আমি গবেষণার সুযোগ নিতে পারছি না।"* এই কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র ঐ তরুণটিই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহুমানিত সন্ন্যাসী, অন্যতম সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ – জাগতিক বিষয় ছেড়ে সারা জীবনকে যিনি আধ্যাত্মিক সাধনারূপ গবেষণায় উৎসর্গ করে গিয়েছেন।

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজের জন্ম ১৯৩১-এর ১৭-ই অক্টোবর অধুনা বাংলাদেশ, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের তিপ্পেরা জেলার আখাউরা গ্রামে। বাবা শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী সেকালের আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে কাজ করতেন। লামডিং স্টেশনে তিনি টেলিগ্রাফ বিভাগে প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে সত্যরক্ষা করতে গিয়ে ছয়মাস তাঁকে জেল খাটতেও হয়েছে। মা শ্রীমতী শেফালিকা চৌধুরী একদিকে ধর্মপ্রাণা, অপরদিকে সারস্বত চর্চায় অত্যন্ত আগ্রহী। সেকালে ঐ অঞ্চলে ধর্মীয় বিষয়ের বক্তা হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সর্বভারতীয় মহিলা সমিতির লামডিং শাখার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল।

*যদিও সাধারণভাবে আমরা শুনেছি যে, পূজনীয় মহারাজ ফলিত মনোবিজ্ঞান বা Applied Psychology-র ছাত্র ছিলেন, কিন্তু মহারাজের নিজের এই স্মৃতিচারণা আর আমাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের মনে হয়েছে – পূজনীয় মহারাজের এই পর্যায়ে মূল বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব, তবে বিশেষ পত্র ছিল অ্যাডভান্সড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জানিয়েছেন যে, গোলপার্কে থাকাকালে তিনি যখন পূজনীয় স্বামী প্রভানন্দজীর সঙ্গে এই সংস্কৃতিমনস্কা বৃদ্ধাকে দর্শন করেছেন, তখনও শুনেছেন যে বিদুষী জননী তাঁর বিদ্বান সন্তানের কাছে জানতে চাইছেন আর কী কী নতুন বই প্রকাশিত হোল। বাবা-মার তিন ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। নাম ছিল বিবেকানন্দ চৌধুরী বা বরুণ। শোনা যায় যে, যখন তিনি মাতৃগর্ভে তখন সেই অঞ্চলে কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলত তাঁদের একটি অন্য জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে তাঁরা আবার নিজগৃহে ফিরে আসার সুযোগ পান। জন্মের কিছুদিন পর এক মুসলিম ফকির বাড়িতে এসে নবজাত সন্তানকে আশীর্বাদ করতে চান। মা তাঁকে কোলে করে নিয়ে এলে, তিনি চামর দুলিয়ে গান গেয়ে ছেলেকে দেখে মন্তব্য করেন, 'এ ছেলেকে তো ঘরে রাখা যাবে না'। মা তাঁকে কিছু দক্ষিণা দেবার জন্যে একটু অপেক্ষা করার কথা বলে ভিতরে যান। দক্ষিণা নিয়ে ফিরে এসে আর কিন্তু সেই ফকিরকে দেখতে পেলেন না তিনি। অন্যত্র অনেক খোঁজাখুঁজির পরও আর তাঁকে কোথাও দেখতে পান নি তিনি। কে জানে অনাগত ভাবী কালের কোন্ অব্যর্থ সত্য সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল এই অজানা, হঠাৎ-আসা এক মানুষের মুখে।

নিজের মুখে ছেলেবেলার কথা একটু হাল্কা সুরে বলতেন মহারাজ, "আমি বরাবরই খুব ভুগতাম। আমার যখন ৬-৭ বছর বয়স এমন রক্ত-আমাশয় হয় যে ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছিল – এ ছেলে বাঁচবে না। বাড়ীর লোকেরা শরীর চলে যাবে ভেবে তুলসীতলায় রেখে দিয়েছিল। এরপর উপস্থিত এক বৃদ্ধা বলেন, 'হ্যাঁরে, ছেলে তো এখনো বেঁচে আছে! ওখানে কেন ফেলে রেখেছিস, ওকে তুলসীতলা থেকে নিয়ে ঘরে রাখ। যা হয় ঘরেই হোক।' কিন্তু দেখা গেল, ধীরে ধীরে আবার সুস্থ হয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন ভুগে ভুগে তখন আমার মাথাটা বড় আর শরীর এত শীর্ণ যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারতাম না। পুনরায় ধীরে ধীরে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে শিখলাম।"

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন পূজনীয় মহারাজ। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া নানা উত্তাল পরিস্থিতির কারণেই তাঁকে এই সময় বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন বহরমপুরের লন্ডন মিশনারি সোসাইটি স্কুলে। এরপর তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের চাঁদপুরে জুবিলি হাই স্কুলে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। যদিও ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে আবার তাঁকে তিনসুকিয়া বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। ১৯৪৮-এ ঐ পরীক্ষায় পুরো আসাম প্রদেশে একাদশ স্থান অর্জন করেন তিনি। এরপর তিনি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে আইএসসি পরীক্ষা দেন ১৯৫০ সালে এবং সেখানেও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই তাঁর সহপাঠী ছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আর এক বহুমানিত সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের ভূতপূর্ব সম্পাদক অধুনা-প্রয়াত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অসক্তানন্দজী মহারাজ বা বিষ্ণু মহারাজ। এই পর্বেই সারগাছি রামকৃষ্ণ

মিশন আশ্রমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক বরেণ্য সন্ন্যাসী পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর সংস্পর্শে আসেন এই দুই যুবক।

প্রেমেশানন্দজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারের কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করেছেন মহারাজ, "তিনি আমাকে যেদিন প্রথম দেখেন, আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, কি দেখছেন? তিনি বললেন, তোমার চোখদুটি দেখছি।" প্রেমেশানন্দজী তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। সারগাছি আশ্রমে গেলে প্রেমেশ মহারাজ তাঁর প্রিয় বরুণকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে অনেক রকম গল্প করতেন, বাড়ী ফেরার সময় কোন কোন দিন একটি ছাতা নিয়ে মাঠের পথ ধরে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন। প্রেমেশ মহারাজকে বরুণ মহারাজ তাঁর 'Mentor' হিসেবে মনে করতেন। সেই সময় সারগাছি আশ্রম চলতো মুষ্টিভিক্ষার উপর। বরুণ মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন বাড়ীতে বাড়ীতে একটা কৌটো দিয়ে আসতেন, আর বাড়ীর লোকেরা সেখানে এক মুঠো করে চাল রেখে দিতো। তরুণের দল মাঝে মাঝে গিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে আসতো। একদিন এইভাবে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের কাজ চলছে, এমন সময় বরুণ মহারাজের দাদুর এক বন্ধুর সেটি চোখে পড়ে যায়। তিনি রিক্সা করে যাচ্ছিলেন। মহারাজকে দেখে রিক্সা দাঁড় করিয়ে ডেকে বলেন, "এই শোনোতো খোকা, তুমি না (পূজনীয় মহারাজের দাদুর নাম ধরে) অমুকের নাতি! তোমার এই অবস্থা?" এই সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলে তিনি চলে গেলেন। কিশোরবয়সী মহারাজ অবশ্য সেসব কথায় মাথা না ঘামিয়ে যথারীতি নিজের কাজে চলে গেলেন। একদিন তাঁর মা এসেছেন বহরমপুরে দাদুর বাড়ীতে। অনেকদিন পরে তিনি এসেছেন। কিন্তু মহারাজ তাঁর মাকে বললেন যে তিনি এখন আশ্রমে যাবেন, কথা বলার সময় নেই, রাত্রে কথা হবে। মা অবাক হয়ে বললেন, "সে কিরে, আমি এতদিন পরে তোকে দেখতে এলাম, আর তুই এখনই চলে যাবি। আজ না হয় বাড়ীতে থাক, কাল যাবি!" মহারাজ বললেন, "না তা হবে না। আমাকে যেতেই হবে।" মা আরও অবাক হয়ে বললেন, "সেখানে কার কাছে যাবি? আমি মা! আমার থেকেও সে তোর বেশী আপনার! সে নিশ্চয়ই আমার মতো তোকে ভালবাসে না!" মহারাজ অসংকোচে উত্তর দিলেন, "না সেখানে একজন মহারাজ আছেন, তিনি আমাকে তোমার থেকেও অনেক বেশী ভালবাসেন।" মা অবাক হয়ে দুঃখ পেয়ে বললেন, "ছেলে বলে কিগো? আমি গর্ভধারিণী মা, কোন্ আশ্রমে কে আছেন, তিনি নাকি আমার থেকেও বেশী ভালবাসেন!" এমনই এক দিব্য আকর্ষণে প্রেমেশ মহারাজের কাছে বাঁধা পড়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবন-ভূমিতে আধ্যাত্মিক আকুতির বীজ এইভাবেই সেদিন প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

ছাত্রজীবনের এই পর্বেই পূজনীয় মহারাজ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় দেওয়া একটা বক্তৃতা শুনেছিলেন। সেই বক্তৃতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বহরমপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের বক্তৃতাও শুনেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে সেই বক্তৃতার প্রসঙ্গে বলতেন, "তাঁর কথায় এত জোর, এত তেজ দেখলাম, যে মুহূর্তের মধ্যেই যেন রক্ত গরম হয়ে ওঠে।" একবার মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছিলেন, যখন গান্ধিজি নোয়াখালী যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

থাকাকালীন দেশপ্রিয় পার্কে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছিলেন। সেটিও তাঁর কাছে অসাধারণ লেগেছিল।

বস্তুত পূজনীয় প্রেমেশানন্দজীর জন্যেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আর এক কিংবদন্তী সন্ন্যাসীর – স্বামী লোকেশ্বরানন্দের। ১৯৫০-এ তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। সেই সময় মাত্র ১৮ টাকা না থাকার কারণে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি তিনি। কোলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সম্পাদকত্বে তখন রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রাবাসটি পরিচালিত হচ্ছে। সেখানেই পূজনীয় কানাই মহারাজের স্নেহাশ্রয়ে থাকার সৌভাগ্য হয় তাঁর। এই পর্বে তাঁর নানা শারীরিক সমস্যার সূচনা হয়। দীর্ঘ দিন চিকিৎসায় থাকার পরে এবং তিনবার ধরে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে গলব্লাডার এবং অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশান করা হয়। এর ফলে প্রায় নয় মাস নষ্ট হয়ে যায় তাঁর। ইতিমধ্যে চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ে এবং তারও চিকিৎসা চলতে থাকে। যাই হোক, সমস্ত অসুস্থতার মধ্যেও তিনি ১৯৫৩-তে স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৫৪-তে সাইকোলজি নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা শুরু করেন। বিএসসি পাশ করার পরে কয়েক মাস তিনি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অরগানাইজার পোস্টে চাকরি করেন। ১৯৫৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি।

ইতিমধ্যে ১৯৫৫-এর ২১-এ মে তারিখে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তদানীন্তন সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন তিনি। অন্তরে পৌঁছে গেছে অন্য জীবনের আহ্বান। স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিমধ্যেই তিনি ও কয়েকজন যুবক 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নিজেদের উৎসর্গ করার কাজে সংকল্প গ্রহণ করেছেন। উচ্চতর শিক্ষার লোভনীয় প্রস্তাবও অনায়াস নম্রতায় পিছনে ফেলে এসেছেন মহারাজ। পাথুরিয়াঘাটার রামবাগান বস্তির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁরা। অবশ্য এই সময়েই পাথুরিয়াঘাটার ছাত্রাবাস আরো বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে পৌঁছানো শুরু করেছিলো অধুনাতন নরেন্দ্রপুরের জমিতে। এমএসসি পাশ করার পর দুবছর পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর ছত্রছায়ায় থেকে স্বামীজীর আদর্শে সমাজ ও গ্রামের উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হলেন। এই পর্বে তিনি সদ্য-স্থাপিত নরেন্দ্রপুরের ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল এডুকেশান অ্যান্ড রিক্রিয়েশানের ডাইরেক্টার হিসেবে কাজ করেছেন দুবছর। ইতিমধ্যেই ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে একদিন তিনি পৌঁছে গেলেন আসামে বাবা-মায়ের কাছে। উদ্দেশ্য – জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাসী হিসেবে যোগদানের জন্যে মায়ের অনুমতি লাভ। প্রার্থিত অনুমতি পেয়ে ফিরে এলেন নরেন্দ্রপুরে। ১৯৫৮-র ২০-এ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্রপুরেই যোগদান করলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭ – দীর্ঘ প্রায় এক দশক কাটিয়েছেন নরেন্দ্রপুরেই। ইতিমধ্যে ১৯৬২-র ৮-ই মে শঙ্করজয়ন্তীর পুণ্য তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা লাভ করেন। নাম হয় ব্রহ্মচারী গিরিশচৈতন্য। এরপর ১৯৬৬-র ২২-এ ফেব্রুয়ারি

পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা পান মহারাজ। নাম হয় স্বামী প্রভানন্দ।

কোন ভুল নেই যে পূজ্যপাদ প্রভানন্দজীর জীবনে পাথুরিয়াঘাটা এবং নরেন্দ্রপুর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের সে নির্মীয়মাণ কাল অনেক স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে থম্কে থম্কে এগিয়ে চলার কাল। তীক্ষ্ণ মেধা, অনন্য মৌলিক চিন্তাশক্তি, দুর্বার কর্ম-প্রেরণা – এই তিনটি বিরল সম্পদকে একত্রে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের দেশ-গড়ার, শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে পাথেয় করে তরুণ যুবক বরুণ জীবন-সংগ্রামের যে বন্ধুর পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ব্রহ্মচারী গিরিশচৈতন্য হয়ে স্বামী প্রভানন্দ পর্যন্ত সেই পথেই চলেছে তাঁর নব নব উদ্ভাবনের, বহুমাত্রিক উদ্যোগের অভিযাত্রা। তাঁর সেই পথ-চলা তাঁর জীবনকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করেছে, আর উত্তরকালকে বিস্ময় দৃষ্টিতে দেখিয়েছে এই মহান পুরুষের ক্রমবিকাশের আলোকস্নাত অধ্যায়কে।

সেই সময় উত্তর কলকাতার অন্যতম কুখ্যাত বস্তি ছিল রামবাগান। এই এলাকা ছিল মূলত সমাজবিরোধীদের দখলে। সেইসময় এই এলাকার একজন স্থানীয় বাসিন্দা এবং সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন জীবনকৃষ্ণ মানিক। তিনি স্থানীয় এলাকার পরিবেশ, পরিস্থিতি ও মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য নানা সামাজিক কাজের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে। লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই কাজের দায়িত্ব দিলেন বরুণ ও বিষ্ণুদের উপর। বিষ্ণুপ্রসাদ ইতিমধ্যে ছাত্রাবাসে যোগদান করেছেন। আরও অনেক গুণী মানুষের সাহায্যে ১৯৫২ সাল থেকে রামবাগান এলাকার স্থানীয় মহল্লাতে সমাজসংস্কারের কাজ চলতে লাগল। কলেজের ক্লাসের পর অনেকদিন রাত ১১টা পর্যন্ত তাঁরা কাজ করতেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের প্রেরণা এবং যুবক বরুণের শ্রম এই কাজে চালিকাশক্তিরূপে দেখা দিয়েছিল। এই জাতীয় কাজের ফলে ঐ অঞ্চলে এক বিপুল পরিবর্তন সংগঠিত হয়। তবে এই পরিবর্তনের পথ মসৃণ ছিল না। একবার নাইট-স্কুলে পড়ানোর সময় বরুণকে পেছন থেকে অতর্কিতে তরোয়ালের কোপ দিতে উদ্যত হয়েছিল এক ব্যক্তি। করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় সেবার তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। এই সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি তাঁরা 'উদয়াচল' নামে হাতে লেখা একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন। এই ম্যাগাজিনে বিবিধ প্রবন্ধের পাশাপাশি থাকতো ছাত্রদের আঁকা সুন্দর ছবি। যুবক বরুণের আঁকা ছবিও স্থান পেয়েছে এই ম্যাগাজিনে।

এরপর ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ছাত্রাবাস পাথুরিয়াঘাটা থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করল উখিলা-পাইকপাড়ায় যা আজকের স্বনামধন্য নরেন্দ্রপুর। ছাত্রদের পড়াশুনার পাশাপাশি সমাজসেবার কাজ চলতে লাগল। গ্রাম বাংলায় এবং শহরের বস্তি অঞ্চলে সেবামূলক কাজের জন্য ১৯৫৭ সালে গঠন করা হলো Institute of Social Education and Recreation (ISER) এবং তার ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন বিবেকানন্দ চৌধুরী বা বরুণ। এরপরের ঘটনা তো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাকাজের ইতিহাসে এক বিরল-উজ্জ্বল আখ্যান। আমরা জানি, ইতিমধ্যে ১৯৫৮ সালে তিনি নরেন্দ্রপুর আশ্রমেই ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদান

করেন। অখণ্ড চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার ২০টি গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মধ্যে দিয়ে সেদিন শুরু হয়েছিল গ্রাম উন্নয়নের কাজ। ঐ সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রপুরে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য করা হলো Dairy, Poultry এবং Apiary-তে ছোট্ট আকারের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। মহারাজের উৎসাহে ও ব্যবস্থাপনায় শুরু হলো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম এবং একমাত্র গ্রামোন্নয়নমূলক বাংলা মাসিক পত্রিকা 'সমাজশিক্ষা'। তাঁর উদ্যোগে সহজ ভাষায় অনেক শিক্ষামূলক পুস্তিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর লেখা 'মুসলিম সন্ত', 'সবার মা সারদা', 'লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ', 'খ্রিস্ট সন্ত' উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য তাঁর বিস্তৃত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাবনা ছিল। সেই ভাবনা রূপায়ণে তিনি গ্রামীণ উৎপাদিত দ্রব্যকে কেন্দ্রে রেখে, একটি মেলা সংগঠন শুরু করেন। সেই সঙ্গে থাকত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আরও নানা জনমুখী আকর্ষণীয় বিষয়। আশে পাশের নানা গ্রাম জনপদের মানুষ নরেন্দ্রপুরে মেলা উপলক্ষে একত্রিত হতেন। একজন দূরদ্রষ্টারূপে মহারাজ একদিকে ধীরে ধীরে সঞ্চার করতে চাইছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে পল্লিবাসীদের মধ্যে গড়ে তুলতে চাইছিলেন সমবায় কর্মশক্তির উদ্দীপনা ও প্রবাহ।

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন লোকশিক্ষা পরিষদের কাজ করতে গিয়ে তিনি। পরবর্তীকালে এমন বেশ কিছু ঘটনার কথা বলতেন সেবকদের বা কাছে থাকা তরুণ-যুবকদের। সেরকমই একটি ঘটনার উল্লেখ করবো আমরা তাঁর নিজের কথায়, "লোকশিক্ষা পরিষদের কাজে তখন নানা জায়গায় যেতে হতো। একবার মেদিনীপুরে রিলিফের কাজে গেছি। তখন সেখানে যাবার জন্য এত সুন্দর রাস্তা ছিল না। মাঝে নরঘাটে নদী পেরিয়ে যেতে হত। একবার বাসে করে নদীর এপারে নেমে খেয়া পেরিয়ে অপর পারে মুরাদপুর গেছি। কাজ শেষ করে নদীর খেয়া পেরিয়ে যখন এ পারে পৌঁছলাম তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। কোলকাতার বাস পেলাম না। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল, সেখানে গিয়ে তাদের বললাম, রাতটা থাকবার একটু ব্যবস্থা করে দিতে। তারা অপরিচিত লোক বলে কোন সাহায্যই করলো না। কোলকাতা যাবার বাস ভোর পাঁচটায়। এতক্ষণ কি করি! সারাদিনের পরিশ্রমে তখন প্রচণ্ড ক্লান্ত। শেষে বালির চরেই কোনোরকমে শুয়ে পড়লাম। ওমা দেখি পিঠে কি যেন একটা লাগল। ধরমড়িয়ে উঠে পড়লাম। দেখি একটা কুকুর আমার পিঠে একরকম হেলান দিয়ে শুয়েছে। আমি আবার সে স্থান ত্যাগ করে পাশে আর একটা জায়গায় বিশ্রাম নিতে গেলাম। খানিক পরে দেখি সেই কুকুরটি আবার আমার পিছনে গিয়ে শুলো। বোধ হয় একটু গরম পাচ্ছে বলে বারবার এই রকম করছে। আমিও এইভাবে স্থান পরিবর্তন করে করে শেষে বাসে এসে বসলাম। তারপর বাস ছাড়লে কোলকাতায় ফিরলাম।"

এইভাবেই দুর্বিপাক আর ঝুঁকিকে সঙ্গে নিয়ে সেবাকাজে নিজেকে ক্লান্তিহীনভাবে উৎসর্গ করেছিলেন মহারাজ। বস্তুত, এখন যে লোকশিক্ষা পরিষদ তৈরি হয়েছে এবং সে যে কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার নেপথ্যে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও স্বামী প্রভানন্দজীর ভাবনা বিদ্যমান। স্বামী প্রভানন্দজী এই সংস্থাকে একটি সংগঠনমূলক পরিকল্পনায় বেঁধে নিয়েছিলেন।

সেই পথেই পরবর্তীকালে প্রথিতযশা শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ও আরো কিছু দক্ষ, সেবাপরায়ণ ব্যক্তির সহযোগিতায় লোকশিক্ষা পরিষদ তার কর্মপরিধির ব্যাপক বিস্তার সাধন করতে পেরেছিল।

ইতিমধ্যেই বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়ে গিয়েছে। সেখানে নির্ধারিত সময় কাটিয়ে ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের পর তাঁর নাম হয়েছে ব্রহ্মচারী গিরিশচৈতন্য। ১ জুলাই ১৯৬২ ব্রহ্মচারী গিরিশচৈতন্য নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হলেন। একদিন যিনি গ্রামের উন্নয়নের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, আজ তাঁর উপর দায়িত্ব পড়ল প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার। বিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা উভয় মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সকলের কৌতূহল এই ছোটখাটো, ছিপছিপে চেহারা এবং উজ্জ্বল দৃষ্টিসম্পন্ন নতুন প্রধান শিক্ষককে নিয়ে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সকলে টের পেল তিনি কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ, কড়া ধাতের মানুষ। দিন যতই গড়াতে থাকল সকলে বুঝতে পারলেন যে, এই নবীন ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও সহৃদয়তার এক অদ্ভুত মিশেল। তাঁর কাছাকাছি যেতে ভয় লাগে, কিন্তু তাঁর গভীরতা অনুভব করলে মাথা নুয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সকলের 'বরুণদা' হয়ে উঠলেন। তাঁর সময়ের এক ছাত্র বলত যে, মহারাজ কোনো রূঢ় ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু তাঁর চোখের চাহনিতেই সকলে সতর্ক হয়ে যেত। শুধুমাত্র আবেগতাড়িত না হয়ে প্রখর মেধা দিয়ে তিনি সব কিছুই যাচাই করে নিতে ভালবাসতেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কোনো এক ছাত্র মন্তব্য করেছিল, "যুক্তি ও বিচার ছাড়া কোনও বিষয়ে সহসা মন্তব্য তিনি করবেন না। আর সেই মন্তব্যের মধ্যে থাকবে ছুরির ধার। আর সাইকোলজির (কাজেই ধরে নেওয়া যায় বিজ্ঞানেরই) লোক হয়েও এক অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল ইংরেজির প্রতি। ইংরেজিটা সুন্দর বলতেনও"।

প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁর দূরদৃষ্টির দৃষ্টান্তও আমরা পাই। তিনি সকল বিষয়ে যা পরিকল্পনা করতেন তা হতো সুদূরপ্রসারী। স্কুলের বর্তমান যে পরিকাঠামো অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক ডিপার্টমেন্ট, পরীক্ষা পদ্ধতি, হবি ক্লাব, খেলাধূলা (আউটডোর ও ইন্ডোর) ইত্যাদি বহুকিছুই মহারাজের চিন্তাপ্রসূত। শিক্ষকদের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকতো। শিক্ষকরা ছাত্রদের নিয়মিত হোম-ওয়ার্ক দিচ্ছেন কিনা এবং সেগুলি শিক্ষকরা দেখছেন কিনা সেই ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ রাখতেন। গরীব ও পড়াশোনায় দুর্বল ছাত্রদের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল। সন্ধেবেলা স্টাডির সময় নিঃশব্দে চলে যেতেন হোস্টেলে। পাঠরত ছাত্রদের ভুলভ্রান্তি চোখে পড়লে ধরিয়ে দিতেন। কোনো ছাত্রের বিশেষ কোচিং দরকার হলে তার ব্যবস্থাও করতেন।

প্রথম থেকেই ছাত্রদের "টোটাল ডেভলপমেন্ট" ঘটানোই হয়ে উঠেছিল মহারাজের মূল লক্ষ্য। ছাত্রদের ডায়েরি লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন – একথা এখনও মনে রয়েছে তাঁর সময়ের এক প্রাক্তন ছাত্রের। ডায়েরির নাম ছিল My Plan। ডায়েরিতে শুরুতে 'My Pledge' বলে লেখা থাকতো শপথ বাক্য, "I shall pay attention to every aspect of my growth—physical, intellectual, emotional, social, moral and spiritual..."। ডায়েরিতে দিনের শেষে সবকিছুর বিবরণ লিখতে হতো। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য

কিছু গাইডলাইন থাকতো এই ডায়েরিতে। সেইসঙ্গে সপ্তাহ শেষে আত্মসমীক্ষা করার জন্য দেওয়া ছিল কিছু প্রশ্ন। নিজের এই মূল্যায়নের ফল পেতে ছাত্রদের দেরি হয়নি।

যেখানেই প্রয়োজন ও সুযোগ হয়েছে, ছাত্রদের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের এক ছাত্র তার আশ্রম জীবনের শেষদিনে জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি যাবার জন্য আশ্রম গেটে অপেক্ষারত। মহারাজ তখন গাড়ি নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন। জিনিসপত্র-সহ তাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। সুবিধেমতো জায়গায় নামিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, "ভাল থেকো"। আপাত-গম্ভীর বরুণদার এই স্নেহ বড় দাগ কেটেছিলো ওই ছাত্রের মনে। তবে গম্ভীর প্রকৃতির হলেও প্রধান শিক্ষক মহারাজ রসিকতা করার সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। বিদ্যালয়ের সায়েন্স বিভাগের ছাত্রদের তখন স্টাডি ট্যুরে নিয়ে যাওয়া হতো। সেই দেখে হিউম্যানিটিজ শাখার কয়েকজন ছাত্র মহারাজের অফিসে গিয়ে নার্ভাস হয়ে বলে বসল, "বরুণদা, আমরা হিউম্যানিটিজের ছেলেরা একটা এডিটোরিয়াল ট্যুরে যেতে চাই, অন্যরা তো যায় দেখি"। 'এডুকেশনাল ট্যুর'-এর জায়গায় 'এডিটোরিয়াল ট্যুর'! মহারাজ রসিকতা করার সুযোগ ছাড়বেন কেন? তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এডিটোরিয়াল ট্যুরে! সেটা কী জিনিস?" ছাত্রটি ভুল শুধরে নিল। আর মহারাজ মজা করে বললেন, "আমারও তো ইচ্ছে করে স্টাডি ট্যুরে জার্মানি যেতে, কিন্তু আমায় পাঠাচ্ছে কে?" যাই হোক সেইবার হিউম্যানিটিজের দশম শ্রেণিকে স্টাডি ট্যুরে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিলো।

সেই সময়ের ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সকলেই আজও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন মহারাজের কথা। "স্বামীজী যে জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগের গূঢ় মিলন দেখতে চাইতেন নতুন প্রজন্মে, তারই এক অপূর্ব নমুনা হয়ে উঠছিলেন গিরিশচৈতন্য"— এক প্রাক্তন ছাত্রের এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় মহারাজের সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন। ৫ নভেম্বর ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

নরেন্দ্রপুরের অধ্যায় শেষে পূজনীয় মহারাজ সারদাপীঠের অন্তর্গত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগ দেন ১৯৬৮-র ৪ঠা এপ্রিল তারিখে। সে ছিল এক বিধ্বংসী রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্যোগময় কাল। তার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বিদ্যামন্দিরের শুভ্র অলিন্দেও। কিন্তু মহারাজ তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভূত প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার জন্যে। সেই সময়ের তাঁর দুই ছাত্র যাঁরা বর্তমানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী, তাঁরা উভয়েই জানিয়েছেন যে, নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন ছাত্রেরা যখন তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছিল এক অন্যায্য দাবী আদায়ের ছলনা করে, তখন তিনি কোনভাবেই তাদের কথা মেনে নেন নি। অথচ সেই ছাত্রদের ঘেরাও থেকে তাঁকে মুক্ত করবার জন্যে যখন সরকার-প্রেরিত নিরাপত্তারক্ষীরা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, তখন তিনি অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে জানান যে ওই নিরাপত্তারক্ষীরা যেন আর না এগোন। তাঁর সেই মূর্তি দেখে ওঁরা থেমে যান। পরে কয়েকজন অধ্যাপকের মধ্যস্থতায় বিষয়টির আংশিক সমাধান হয়। সেই কালে তাঁর অসম সাহসিকতার অনেক কাহিনি আজও ছড়িয়ে

আছে সেকালের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে। এরকমই আরো একবার বিদ্যামন্দির ও বেলুড় মঠের মাঝের রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই মহারাজ নিজে বিদ্যামন্দিরের পাঁচিলের ধারে ছুটে গিয়ে পাঁচিলে দুই হাতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে থাকেন। বিদ্যামন্দিরের সেই সময়ের অধ্যাপকেরা প্রশাসনে তাঁর সকলকে নিয়ে চলার মানসিকতার কথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকসংসদ গঠন এবং বিভিন্ন সাব-কমিটি তৈরীর মাধ্যমে শিক্ষকদের কলেজ পরিচালনার নানা কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার ঐতিহ্যের তিনিই সূচনা করেন। সেই ধারা আজও এই মহাবিদ্যালয় একইভাবে রক্ষা করে চলেছে। প্রশাসনের পাশাপাশি ছাত্রদের প্রতি তাঁর দরদী নজরটির কথা বিনম্র প্রণতির সঙ্গে স্মরণে আনেন সেই সময়কার ছাত্রেরা। সেই সময়ের প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে ভর্তি হওয়া গ্রাম-থেকে-আসা দুই ছাত্রের উপরে সিনিয়র ছাত্রদের অবাঞ্ছিত দুর্ব্যবহারের খবর তাঁর কর্ণগোচর হতেই তিনি বিষয়টি নিয়ে যথাযথ অনুসন্ধান চালান এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন আর এই নিরীহ দুই ছাত্রকে পরম স্নেহে নিশ্চিন্ত করে দেন। দীর্ঘ ছুটিতে ছাত্রেরা যখন বাড়ি যেতো, তখন অনেকের কাছেই তাঁর কাছ থেকে পোস্টকার্ড পৌঁছাতো, যেখানে তিনি তাঁদের অন্যান্য খবরাখবর নেওয়ার সঙ্গে জানতে চাইতেন যে তারা পড়াশুনা কেমন করছে। সজাগ আর দরদী শিক্ষাব্রতীর এই মহৎ বিগ্রহখানি আজও তাঁর ছাত্রেরা তাই মনের গভীরে সযত্নে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে।

বিদ্যামন্দির পর্বের পরে ১৯৭২-এর ১লা জানুয়ারি পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সহ-সম্পাদক রূপে প্রেরিত হন। তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় পূজনীয় মহারাজ সেবাপ্রতিষ্ঠানে সেবারত ছিলেন।

এরপর ১৯৭৫-এর মে মাসে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার দায়িত্বভার দিয়ে পাঠানো হয়। ছাত্রদের সর্বতোমুখী বিকাশের পরিকল্পনা মাথায় রেখে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ রুক্ষ পুরুলিয়ার বুকে 'বিদ্যাপীঠ' স্থাপন করেছিলেন ১৯৫৭ সালে। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরিরূপে স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার সুচারুভাবে বহন করেছিলেন। তাঁর এই কার্যকাল সেখানকার বিদ্যাধারায় ব্যাপক পরিপুষ্টি এনেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে মহারাজের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিপুল প্রজ্ঞাই ছিল তার উৎস। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে তিনি যেসব নবতর ভাবনার সঞ্চার করেছিলেন, বিশেষ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এখনও সেইসব ধারা অনুসৃত হয়ে চলেছে, উত্তরোত্তর সাফল্যদান করছে। স্কুলের দৈনন্দিন কাজে ও ছেলেদের পড়াশুনার মানোন্নয়নে তিনি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তিনি একাধিক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষককে নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিদ্যাপীঠকে দেশের অন্যান্য স্বনামধন্য বিদ্যালয়গুলির সমকক্ষ করে তোলার জন্য শিক্ষকদেরকে সেইসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে পাঠাতেন। এইভাবে দুন স্কুল সহ চেন্নাই, দিল্লি, রাঁচি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গার নামী স্কুলগুলি থেকে পঠন-পাঠনের রীতি সংগ্রহ করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকতার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অনুসারী করে গড়ে তুলতে পুরুলিয়া আশ্রমে তিনি নির্মাণ করেন অনবদ্য এক সংগ্রহশালা। ১৯৮০ সালে তদানীন্তন রাজ্যপাল মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছিলেন। বিভিন্ন মনীষীর হস্তাক্ষর, অসামান্য চিত্রকলা, অনেক বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও প্রচুর সুপ্রাচীন ভাস্কর্য এখানে স্থান পেয়েছে। মূলত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে ভাস্কর্যগুলি সংগ্রহ করে সেগুলির ইতিহাসকে তিনি ধ্বংস এবং চোরাচালানের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এই অমূল্য সংগ্রহগুলির মধ্যে রয়েছে ১২০০ বছরের পুরাতন ভাস্কর্য।

বিদ্যাপীঠের পঠন-পাঠনে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হল হবি ক্লাবকে ঢেলে সাজানো। ফলত সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রেরা তাদের পছন্দের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ইতিহাস, ভূগোল, ভারততত্ত্ব, মিউজিওলজি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উন্নতস্তরে গবেষণাধর্মী অনুশীলন করার সুযোগ পেল। বছর-শেষে তাদের বানানো হবি ক্লাসের সেই সব মডেল নিয়ে মহারাজ বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজনের ব্যবস্থা করতেন। এর প্রভাবে ছাত্রেরা জেলাস্তরে তো বটেই, এমনকি রাজ্য এবং জাতীয় স্তরেও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিত। হবি ক্লাবের কাজ নিয়ে প্রকাশিত হলো তিনটি 'Hobby Projects'। বৃহত্তর ক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে, কীভাবে জীবনে সফল মানুষ হয়ে উঠতে হবে সেই বিষয়ে পূজনীয় মহারাজ ছাত্রদের প্রতিনিয়ত উপদেশ দিতেন।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকপাল শিক্ষাবিদদের নিয়ে এসে তিনি অনেক সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হিমাংশুবিমল মজুমদার এই পর্বেই বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন। এঁদের মত মানুষদের মূল্যবান শিক্ষাভাবনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে বিদ্যাপীঠের উপর। বর্তমানে বিদ্যাপীঠে রবীন্দ্রজয়ন্তী, শিক্ষক দিবস, বিজ্ঞান দিবস, বর্ষাবোধন ও বনোৎসব, শারীরশিক্ষা দিবস, নারায়ণ সেবা দিবস ইত্যাদি উৎসবগুলি যে বিপুল উৎসাহের চেহারা নিয়ে পালিত হয়, তার মূল রূপকার ছিলেন পূজনীয় মহারাজ। বিদ্যাপীঠে তিনিই প্রথম ছেলেদের জন্য বাস্কেট বল খেলার সূচনা করেন। আবার শিক্ষকদের নিয়োগকালীন ইন্টারভিউতে তিনি পদপ্রার্থীকে ভালভাবে পরখ করে তবে নিতেন। এক শিক্ষক মহারাজের স্মৃতিচারণায় বলছে, "পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার সময়ে একজন শিক্ষক আমাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার চারটি লাইন বলতে বলেছিলেন। আমি কবিতার সেই লাইনগুলির মধ্যে একটি শব্দ বাদ দিয়েছিলাম। পূজনীয় মহারাজ সেই শব্দটি ধরতে পেরেছিলেন এবং আমাকে বলে দিয়েছিলেন। মহারাজ ইংরেজী বিষয় নিয়ে পড়াশুনা না করলেও সহজেই আমাকে তা বলে দিতে পেরেছিলেন।"

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে স্কুলটিকে নতুন করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তিনি সেখানকার খরা অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। গ্রামীণ মানুষের সেবার জন্য বিদ্যাপীঠে একটি অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ১৯৭৯ সালে নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ ও পুরুলিয়া নেহরু যুব কেন্দ্রের সাহায্যে পুরুলিয়া জেলায়

গ্রামীণ যুব-সংস্থা 'কল্যাণ' প্রতিষ্ঠা করেন। বিবেকানন্দনগরে পোষ্ট অফিস এবং ব্যাঙ্কের বাড়িগুলি তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল। পুরুলিয়া শহরে ভক্তমণ্ডলীকে সংগঠিত করে 'সারদা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়মিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠের সূচনা করেন।

তাঁর নেতৃত্বে পুরুলিয়া আশ্রমের অন্তেবাসীরা একটি স্বস্তির আশ্রয় লাভ করেছিল। তিনি নিজে যেমন কখনই শক্তি ও সময়ের বৃথা অপচয় করতেন না, তেমনই অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরাও যেন সেই বিষয়ে সজাগ থাকে সেদিকে নজর রাখতেন। রাতের কাজ শেষ করতে সময় যতই লাগুক না কেন, প্রত্যহ চারটের সময় ঠাকুর ঘরে তাঁকে দেখা যেত। আশ্রমের অন্যান্য ব্রহ্মচারীদেরও ভোরবেলায় সাধন-ভজন করার ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। একবার এক ব্রহ্মচারী মহারাজের ভোরবেলায় ঠাকুরঘরে যেতে দেরি হওয়াতে পূজনীয় মহারাজ পরে তাকে অফিস ঘরে ডেকে পাঠান। তখন ব্রহ্মচারী মহারাজ জানান যে তাঁর কাছে অ্যালার্ম ঘড়ি না থাকায় ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে। পূজনীয় মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁর টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটি ব্রহ্মচারী মহারাজকে দিয়ে দেন এবং বলেন যে পরবর্তী সময় থেকে যেন ভোরবেলায় ঠাকুরঘরে সময়মতো যান। এইভাবে ব্রহ্মচারীরা নিয়মিত সকালবেলায় উঠছেন কিনা এবং নিয়মিত জপ-ধ্যান করছেন কিনা সেই সকল বিষয়ে তিনি খোঁজ নিতেন এবং প্রয়োজনবোধে আপ্রাণ সাহায্য করতেন। এছাড়া সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ-অধ্যয়নাদি করতেন। মঠ-মিশনের অনেক পুরানো গল্প, অনেক প্রাচীন সাধুদের কথা তাঁর কাছ থেকে প্রায়শই শোনা যেত। তাঁর সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ যাদের অল্প সময়ের জন্যও হয়েছে, তারা সকলেই আধ্যাত্মিক এবং বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ের আলোচনায় ঋদ্ধ হয়েছেন। পুরুলিয়ায় যেসব সাধুরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা বলেন যে, পূজনীয় মহারাজের ব্যক্তিজীবনে সংযম ও সহনশীলতা ছিল দেখার মত। কোনোদিনই তাঁকে বলতে শোনা যায়নি যে খাবারটি ভালো নয় অথবা স্বাদু হয়নি। তাঁর সময়ানুবর্তিতা ছিল আর এক শিক্ষণীয় বিষয়। কোনো কারণে গাড়ির ড্রাইভারকে যদি আগে থেকে সময় দেওয়া থাকতো তাহলে উনিও যথাযথ সময়েই সেখানে উপস্থিত হয়ে যেতেন।

শুধু সাধুরা নন, কর্মীরাও তাঁর মধ্যে এক স্নেহশীল অভিভাবকের সন্ধান তখন থেকেই পেয়েছিলেন। সেই সময়ের এক তরুণ শিক্ষক আজও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর কথা স্মরণে রেখেছে। ১৯৭৬ সালে সে বিদ্যাপীঠে যোগ দিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই সেখানে তার মন টিকছে না। তাই সাত দিনের মধ্যে ইস্তফা দিয়ে প্রধান শিক্ষক মহারাজকে চিঠি দিয়ে বসল। খবর পেয়েই মহারাজ তাকে ডেকে পাঠালেন, সস্নেহে তার সঙ্গে কথা বললেন। তার মনে পরিবর্তন এলো। সেবারের জন্য সে আর গেল না। কিন্তু একমাস পরে আবার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যাপীঠ ছেড়ে চলে যাবে। তাই মহারাজের কাছে বিদায় নিতে গেল। এবার আর মহারাজ বাধা দিলেন না। শুধু বললেন, "সত্যিই যাচ্ছ? ফিরতে হবে তোমাকে। ফিরতে যদি চাও, জানাবে"। শিক্ষকটি বাড়ি গেল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে বাড়িতে আর মন টিকছে না, বিদ্যাপীঠের প্রতি অনবরত এক টান অনুভব করতে লাগল সে। শেষে মহারাজকে

বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একখানা চিঠি দিল। সঙ্গে লিখল যে বাড়িতে তার আর সত্যিই ভাল লাগছে না। মহারাজকে দেওয়া সমস্ত চিঠির উত্তর সে পেত। এই চিঠিরও উত্তরে মহারাজ তখনই লিখলেন, "তুমি চলে এসো।" শিক্ষকটি বাড়ি থেকে ফিরে এল। তারপর পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যাপীঠে সে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছে।

তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য (অর্জুনগাছের ফুলের পরাগ তাঁর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে) তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে যান। মহারাজ যেদিন সন্ধ্যাবেলার আরতির পর বিদ্যাপীঠ ছেড়ে বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন, অনেক শিক্ষক ও কর্মীরা এসে জড়ো হয়েছিলেন মহারাজকে বিদায় জানাতে। ঘরের দরজা খুলে মহারাজ বেরিয়ে আসতে নাটকীয়ভাবে লোডশেডিং হয়ে যায়। যেন বড় এক অগ্নিশলাকা হঠাৎ সরিয়ে নেওয়ায় এই অন্ধকার তৈরি হয়েছে। উপস্থিত একজন মন্তব্য করলেন, "মহারাজ, এ কীসের ইঙ্গিত? বিদ্যাপীঠে কি কালো ছায়া নেমে আসবে?" মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "না না, তা কেন? বিদ্যাপীঠ মাথা উঁচু করেই থাকবে।" প্রকৃতই, মহারাজের রেখে যাওয়া প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে বিদ্যাপীঠ উজ্জ্বলতর এক ভবিষ্যতের সাক্ষী হতে সমুজ্জ্বল শোভায় মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় কনভেনশন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন এই কনভেনশন কমিটির সেক্রেটারি। স্বামী প্রভানন্দজীকেও এই কনভেনশন কমিটির অন্যতম সদস্য করে নেওয়া হয় এবং তিনি এখন রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারে থেকে কনভেনশনের কাজ করতে শুরু করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এই সময় 'Rebuild India' নামে একটি পুস্তক স্বামীজীর বাণী ও রচনাবলী থেকে সংকলিত হয়ে কনভেনশন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। কনভেনশনের পরে তাঁর সম্পাদনায় ও তত্ত্বাবধানেই কনভেনশনের সম্পূর্ণ Proceedings, প্রায় ৪০০ পাতার বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। তিনি এই সময় ইন্সটিটিউট অফ কালচারে প্রায় তিন বছর ছিলেন। ১৯৮৩-র ১৮-ই এপ্রিল তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৮৪-র ১৮-ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি মূল কার্যালয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই পদে দীর্ঘ ১২ বছর কাজ করার পর তিনি ১৯৯৫-র ১লা এপ্রিল থেকে অবসর নেন।

বেলুড় মঠের এই পর্বে যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা আজও সশ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করেন। প্রশাসনের কাজের সাথে সাথে মঠের নবাগত ব্রহ্মচারীদের বা প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ব্রহ্মচারীদের প্রতিও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো। একবার বাংলার বাইরে থেকে একজন এসে বেলুড় মঠের মূল কার্যালয়ে সঙ্ঘে যোগদান করেছে। সময়টা শীতকাল। মহারাজ তাঁর অনেক কাজের মধ্যেও লক্ষ্য করেছেন যে ওই নবাগত ব্রহ্মচারিটির গায়ে কোন শীতের চাদর নেই। মহারাজ একটি শাল তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই ব্রহ্মচারী আজ সঙ্ঘের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী। গভীর আবেগের সঙ্গে সে কথা আজও তিনি মনে রেখেছেন। পূজনীয় মহারাজের স্নেহের সে দানকে আজও তিনি সযত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

নবাগত এই ব্রহ্মচারীরা ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্পর্কিত রচনাবলী নিয়মিত পড়াশুনা করছে কিনা সেদিকে মহারাজ নজর রাখতেন। কোন বিশেষ দিনে যখনই তাঁরা প্রথামত পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করার জন্য যেতেন, তখনই মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন যে, তাঁরা তখন ঠাকুর, মা বা স্বামীজী সংক্রান্ত কোন্ বই পড়ছেন। আসলে এর দ্বারা মহারাজ তাঁদের এই জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রতি সবসময় সতর্ক থাকার দিকেই ইঙ্গিত করতেন।

পূজনীয় মহারাজ সহ-সম্পাদক থাকাকালেই মূল কার্যালয়ের কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে কম্পিউটার আনার প্রয়াস শুরু হয়, বিশেষত অ্যাকাউণ্টস বিভাগের কাজকর্ম প্রথম পর্যায়ে কম্পিউটারাইজড্ করানো হতে থাকে। সেই সময় অনেকের মনেই সংশয় ছিল এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বা তার উপযোগিতা নিয়ে। কিন্তু ঐ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই সময়ের একজন সন্ন্যাসী জানাচ্ছেন যে পূজনীয় প্রভানন্দজী তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন আগামী দিনে সঙ্ঘের কার্যাপ্রণালীতে এই প্রযুক্তি কত উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। এই কাজ করার সময় অনেক বাধার সামনেও তাঁকে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে সেই সমস্ত বাধাকেই নিজের দিকে ক্রমশ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যেকোন সমস্যার মধ্যে অদ্ভুত মুন্সিয়ানায় নিজের মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা যেন তাঁর সহজাত। একবার বেলুড় মঠে সাধারণ উৎসবের আগের রাতে প্রচণ্ড ঝড় হওয়ার কারণে বড় প্যাণ্ডেল অনেক জায়গায় ছিঁড়ে যায়। বৃষ্টির জলও মাটিতে পড়েছিল। তদানীন্তন ম্যানেজার মহারাজ পরের দিনের সকালের অনুষ্ঠানটি নাটমন্দিরে করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ উৎসবের কাজ দেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী সেইমত আয়োজন করছেন। এমন সময় মহারাজ প্যাণ্ডেলে পৌঁছে সেই সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠালেন। অভয় দিয়ে বললেন যে ভয় না পেয়ে প্যাণ্ডেল সারিয়ে নিয়ে এবং জলজমা অংশে কিছুটা বালি ঢেলে দিলে অনুষ্ঠানটিকে সকালে কিছুক্ষণ পর থেকেই মূল প্যাণ্ডেলে নিয়ে আসা যাবে। মহারাজের উৎসাহে এবং নির্দেশ অনুসারে কর্মীরা, সাধু-ব্রহ্মচারীরা সবাই মিলে পরিশ্রম করে পরের দিন সকালে কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠানস্থলটিকে আবার যথোপযুক্ত করে তুললেন।

একজন তরুণ সন্ন্যাসী গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যে স্বামীজীর কথা বলার চেষ্টা করছেন শুনে, তিনি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন যে, সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন যুবক সঙ্ঘে যোগদান করেছেন কিনা। ঐ প্রসঙ্গে তিনি সেদিনের সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে উৎসাহিত করেন এই বলে যে তিনি যেন ভালো ভালো ছেলেদের সঙ্ঘে যোগদানের জন্যে অনুপ্রেরণা দেন।

সঙ্ঘের কাজের প্রতি এক অপূর্ব নিষ্ঠা ছিল তাঁর সহজাত। তারই ফলে কোনদিন তিনি নিজের শরীরকে গুরুত্ব দেন নি। তিনি যখন সহ-সম্পাদক তখন একদিন বেলুড় মঠের মূল কার্যালয়ে কর্মরত এক সন্ন্যাসী দেখেন যে অসুস্থ শরীরে প্রায় দেড় দুই ডিগ্রি জ্বর নিয়েও তিনি নিজের কাজ করতে নেমে এসেছেন ঘর থেকে এবং এক মনে কাজ করে চলেছেন। সেই সন্ন্যাসী কোন চিঠি সই করাবার জন্য মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। চিঠি সই হয়ে যাবার পরে তিনি পূজনীয়

মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "মহারাজ, আপনার কি শরীর খারাপ?" সঙ্গে সঙ্গে পূজনীয় মহারাজের উত্তর, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও কিছু নয়, যাও যাও তোমার কাজ কর।"

এই সময়েরই আর একদিনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন সেই সময়ের বেলুড় মঠের হেড কোয়ার্টার্সে সেবারত এক সন্ন্যাসী। একদিন পূজনীয় প্রভানন্দজী ঐ সন্ন্যাসীকে ডেকে বললেন, "বিকাল বেলা একটু কলকাতা যাব, কাজ আছে, তুমি আমার সঙ্গে যেও।" কথামত বিকেলে সেই সন্ন্যাসী পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন যে, একজন কোর্টের উকিলের সঙ্গে মহারাজের কিছু কাজ ছিল। কাজ শেষে যখন দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে চলে আসছেন, তখন পূজনীয় প্রভানন্দজী ঐ সন্ন্যাসীকে বললেন, "তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম কারণ কাজ শেষ করতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পরে বাইরে গেলে একা যাওয়া উচিত নয়।" সেই সন্ন্যাসী শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই ভেবে যে এত সিনিয়র একজন সাধু তিনি আজ, অথচ কিন্তু একা বাইরে যেতে চান না। সাধুজীবনের আদর্শের প্রতি কি গভীর নিষ্ঠা!

১৯৮৪ সালে ত্রিপুরায় মনু নদীর বন্যায় কৈলাশহর, ধর্মনগর, কমলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। মহারাজ নিজে বন্যাত্রাণে অংশগ্রহণকারী সাধু ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আগরতলা ও কৈলাশহর যান। ঐ সময় ত্রিপুরা জঙ্গী উপদ্রুত ছিল। পূজনীয় মহারাজ নিজে উপস্থিত থেকে সেখানকার মুখ্যসচিব, অর্থসচিব, কৈলাশহরের জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রভৃতিদের সঙ্গে এই সাধু-ব্রহ্মচারীদের পরিচয় করিয়ে দেন, যাতে তাদের কাজের কোন অসুবিধা না হয়। পূজনীয় মহারাজের এই সযত্ন ব্যবস্থাপনার ফলেই ঐ অঞ্চলে প্রায় একমাস ধরে নিরবচ্ছিন্ন সেবাকাজ চালানো সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে সাধারণ সম্পাদক থাকার সময়েও রিলিফের কাজে তাঁর আগ্রহ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

এই সময় ভাবপ্রচার পরিষদের কাজেও তাঁর উৎসাহ ছিল দেখার মত। একবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলনে তিনি একজন পূজায় দক্ষ সাধুকে এবং একজন হিসাবরক্ষার কাজে দক্ষ সাধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন যাতে পরিষদের সদস্য আশ্রমগুলির উৎসাহী ভক্তরা পূজা শিখতে পারে এবং সংগঠনের হিসাব রাখার কাজের ক্ষেত্রেও তাঁদের একটা ভালো ধারণা তৈরী হয়।

এই সময় থেকেই পূজনীয় মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁর এক মহান স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে থাকেন। সেটি হলো রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জন্যে এক সংগ্রহশালা নির্মাণ। এর পরিকল্পনা ও কাজকর্ম হয়ত বীজাকারে আগে থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু এই পর্বেই তা একটি উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার দিকে এগোয়। মহারাজের মধ্যে এক অনুসন্ধানী মন চিরকাল লুকিয়ে ছিল। সেই সময় মহারাজের সঙ্গে কাজ করেছেন এমন এক সন্ন্যাসী স্মৃতিচারণা করছেন এই বলে যে, প্রত্নতাত্ত্বিকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা পূজনীয় মহারাজের মধ্যে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হত। সেই সময় পূজনীয় মহারাজ এই কাজ আরম্ভ করেছেন এমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার ফলে অনেকেই তাঁদের সংগ্রহের জিনিসপত্র পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। পূজনীয় মহারাজ তাঁর নিখুঁত

বিশ্লেষণী দক্ষতা ব্যবহার করে বুঝে নিতে পারতেন কোন্‌টি নেওয়া দরকার। এই কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত বস্তু সংরক্ষণের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেকারণেই পূজনীয় মহারাজ, এই কাজে National Council of Science Museum-এর তদানীন্তন ডাইরেক্টর ডঃ সরোজ ঘোষ মহাশয়কে যুক্ত করেন। এছাড়াও সারা ভারত জুড়ে এক অদৃশ্য সুতোয় তিনি বেঁধে নিয়েছিলেন এরকম অনেক দক্ষ ও অনুসন্ধানী মানুষজনকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও তাঁদের ত্যাগী সন্তানদের relics মঠে ছিল। তবু প্রভানন্দজী দেশ-বিদেশের বিবিধ কেন্দ্র তথা গৃহী ভক্তদের থেকে প্রাপ্ত অনেক relics-এর সংগ্রহ ও যথাযথ সংরক্ষণ করতে আজীবন সচেষ্ট থেকেছেন। বেলুড়ের নতুন মিউজিয়ামের সংলগ্ন সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসীকে দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভ থেকে প্রশিক্ষিত করে আনা—এসবই তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। জয়রামবাটীতে, শ্রীশ্রীমায়ের শয়নকক্ষে রাখা একটি তৈলচিত্র ছিল। মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে ও পরে মূর্তি নির্মাণের আগে পর্যন্ত এই তৈলচিত্রেই শ্রীশ্রীমা পূজিতা হতেন। জীবদ্দশায় মা স্বয়ং ছবিখানি পূজা করেছিলেন। দীর্ঘকালের প্রদীপশিখার কালিতে ওই তৈলচিত্রটি সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছিল। মূল ছবি দেখাই যেত না। প্রভানন্দজীর চেষ্টায় ওই তৈলচিত্রটি তার পূর্বের রূপ ফিরে পেয়েছিল। বর্তমানে তা মিউজিয়ামে রয়েছে। এমনতর relics-এর সন্ধানে দেশ-বিদেশের সর্বত্র তিনি অক্লান্ত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

এই মিউজিয়াম নির্মাণ পর্বে তাঁর অসামান্য পরিশ্রমের কথা অনেকেরই অজানা। অনেকসময় মিউজিয়াম নিয়ে মিটিং করার জন্য তিনি চলে আসতেন বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত কলকাতায় কর্মরত ব্যক্তিদের পক্ষে তা সুবিধের। মিটিং-এর জন্য, দুপুরের রোদ মাথায় তিনি সবার আগেই পৌঁছে যেতেন। তিনি প্রবীণ সন্ন্যাসী, তাই মঠের গাড়িতে আসবেন এই ধারণা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু 'ব্যক্তিগত' কাজের জন্য তিনি মঠের গাড়ি ব্যবহার করতেন না। বেলুড় থেকে বলরাম মন্দিরে আসার জন্য তিনি সত্তর বছর বয়সে গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে মঠ থেকে নৌকায় কুঠিঘাট, সেখান থেকে হেঁটে বাসরাস্তায় এসে, বাস ধরে বাগবাজার আসতেন। তাঁর ফিরে যাওয়াও ছিল একইভাবে।

মঠে মিউজিয়াম নির্মাণপর্বে বেলুড় মঠের মধ্যেই একটা অফিস তৈরির দরকার হয়েছিল। মন্দিরের বেসমেন্ট থেকে জোগাড় হয়েছিল বিভিন্ন চেয়ার-টেবিল-ডেস্ক। যেখানে অফিস গড়ে উঠেছিল, জায়গাটা সুবিধের নয়। জানলা নেই, হাওয়া চলাচলেও বেশ অসুবিধা। কিন্তু প্রভানন্দজী তাতে কোনও সমস্যা হবে এমন অনুভূত হতে দেননি। মঠের সব সাধুই ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হন। প্রভানন্দজীও সকাল সাতটায় প্রাতরাশ সেরে ঐ অফিসে হাজির হতেন। অতো সকালে কেউ আসেন না, তাই তিনি নিজেই সব চেয়ার টেবিল ঝেড়ে পরিষ্কার করে কর্মোপযোগী করে রাখতেন।

পুরানো ছবির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পূজনীয় মহারাজের আন্তরিকতার একটি ঘটনা এখানে আমরা সংক্ষেপে উদ্ধার করলাম। একবার বাগবাজারে মায়ের মন্দিরের বড় ছবিটির উপরের দিকে কোনায় কিছু ছোপ ছোপ দাগ (ফাংগাস)

লেগে থাকতে দেখা গেল। পূজনীয় মহারাজ তা জেনে ডঃ সরোজ ঘোষের মাধ্যমে একজন দক্ষ কারিগরকে এনে সেই দাগ সরিয়ে ছবিটিকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এই কাজটি হয়েছিল মন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, কিন্তু পুনরায় বিকেলে মন্দির খোলার আগে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। এই পুরোটা সময় পূজনীয় মহারাজ তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ মহারাজ এবং আর একজন সঙ্গী সন্ন্যাসী মহারাজকে নিয়ে ঐ জায়গায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ বিশেষজ্ঞ কর্মীটির কাজ তদারক করছিলেন।

একবার বেলগাঁওয়ে ওয়েলিংকার স্টুডিওতে মহারাজ গিয়েছিলেন ঐ অঞ্চলের এক সহকারী সংগ্রাহক এম এস নাঞ্জুন্ডাইয়া এবং বেলগাঁও আশ্রমের এক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে। ওই স্টুডিওর লোকেরাই খবর পাঠিয়েছিলেন যে, ওঁদের কাছে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত আরো অনেক জিনিসের সঙ্গে একটি ক্যামেরা আছে যেটিতে স্বামীজীর বেলগাঁওয়ের ছবিটি তোলা হয়েছিল। মহারাজরা যখন গেলেন, তখন ওনারা অন্য সব জিনিস দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে কভার সহ ক্যামেরাটি বের করে নিয়ে এলেন। মহারাজ কিন্তু কভারসহ ক্যামেরাটি বের করার মুহূর্তেই সঙ্গের ব্রহ্মচারিটিকে বললেন যে, দেখো ওর মধ্যে ক্যামেরাটি কিন্তু নেই। ওনাদেরকে যখন ওটি খুলতে বলা হোল, ওনারা জানালেন যে যেহেতু ওনারা এটিকে খুব পবিত্র একটি জিনিস বলে মনে করেন তাই কখনো কিন্তু এটি খুলে দেখেন নি। মহারাজ বারবার অনুরোধ করায় ওঁরা শেষ পর্যন্ত খাপটি খুললেন এবং সত্যিই দেখা গেল ক্যামেরাটি ওর মধ্যে নেই। পরে ঐ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন যে যেরকমভাবে ক্যামেরার খাপের উপরের অংশটি একটু ভিতরে ঢুকে বসেছিল, তাতেই মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে আসলে ক্যামেরাটি এর মধ্যে নেই। এমনই ছিল পূজনীয় মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

এই সংগ্রহ মন্দিরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহ শেষ পর্যন্ত ছিল। এর দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসী মহারাজদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিতেন সংগ্রহমন্দিরের যাবতীয় খবরাখবর। যখন করোনার কালে পূজনীয় মহারাজ বেলুড় মঠে ছিলেন, তখন একবার বর্তমানে সংগ্রহমন্দিরের ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজকে ডেকে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে পুরো মিউজিয়ামটি তিনি ঘুরে দেখবেন। সেই মত ব্যবস্থা করা হয়। ঐ প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে পূজনীয় মহারাজ তিনদিন ধরে ধীরে ধীরে পুরো সংগ্রহশালাটি ঘুরে ঘুরে দেখেন।

আজ ভাবলে বিস্ময় লাগে কি অদ্ভুত তপস্যা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দির তৈরী করেছিলেন। প্রথমে পুরানো মিশন অফিসে এবং পরে নিজস্ব একটি গৃহে এই সংগ্রহমন্দির স্থাপিত হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষকে তা আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে, আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের সচল ঐতিহ্যকে তাদের মনের মণিকোঠায় চিরকালের জন্যে মুদ্রিত করে দিয়ে যায়।

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর ১৯৯৯-র ২৮-এ জানুয়ারি গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গবেষকের দৃষ্টি ও মন, বিদ্যাচর্চায় প্রবল উৎসাহ, সেই সঙ্গে অধ্যাত্মসম্পদের মেলবন্ধনে স্বামী প্রভানন্দজী ছিলেন এক আকর্ষণীয় ও মহনীয় ব্যক্তিত্ব।

ইন্সটিটিউট-এর সংলগ্ন বেদী ভবনটি ও তৎসংলগ্ন জমিটি ছিল অব্যবহৃত ও জবরদখলকারীদের আওতায়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর প্রচেষ্টায় সেই জমির এক-তৃতীয়াংশ ক্রয় করা হয়। কিন্তু সেখানে মূল ভবন সম্প্রসারণের কাজ আইনি জটিলতায় আটকে যায়। প্রভানন্দজীর উদ্যোগে ঐ এক-তৃতীয়াংশ জমি আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে ইন্সটিটিউটের আওতায় চলে আসে। ২০০২-এর ১৫ মে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। তিন বছরেরও কম সময়ে মহারাজ নতুন ভবনটি তৈরির কাজটি সমাধা করান এবং ২০০৫ সালের ২০ মে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

মহারাজের অধ্যক্ষ হওয়ার আগে গোলপার্কে 'দি সেন্টার ফর ইন্ডোলজিক্যাল স্টাডিজ'-এর একটি শাখা 'স্বামী বিবেকানন্দ আর্কাইভ্স্' শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গৃহী ও সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতাদের সম্বন্ধে সবরকমের তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ হতো। মহারাজের চেষ্টায় ১৯৯৯ সালে গবেষণা বিভাগটি যথার্থই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক গবেষণা বিভাগ, ভারততত্ত্ব বিভাগ ও বিবেকানন্দ আর্কাইভসকে সংযুক্ত করে নাম হয়, 'সেন্টার ফর ইন্ডোলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড রিসার্চ'। এর তত্ত্বাবধানে চালু রয়েছে কয়েকটি পাঠক্রম—যেমন, 'ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফর হিউম্যান ইউনিটি, ব্যবহারিক সংস্কৃত শিক্ষা, ভারততত্ত্ব, ইত্যাদি। প্রথমটি অচিরেই UNESCO-এর স্বীকৃতি লাভ করে। ভারততত্ত্ব বিষয়ে মহারাজের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিয়ে মহারাজের ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'Bharatatattva—Course in Indology'। বস্তুত মৌলিক গবেষণার প্রতি পূজনীয় মহারাজের আকর্ষণ চিরকালই ছিল প্রবল। এরকমই এক গবেষিকার পড়াশুনার প্রতি তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। সেই গবেষিকা যখন ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন, তখন মহারাজ বেলুড় মঠে সাধারণ সম্পাদক। মহারাজ তাঁর নিজস্ব পড়াশুনার খবরই শুধু নেন নি, আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন পাশ্চাত্যের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে সেখানকার ভক্তদের মতামতসমূহ যা কিনা এই গবেষিকা নিজে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বামী প্রভানন্দজীর তত্ত্বাবধানে, নির্দেশে এবং প্রেরণায় 'ইন্সটিটিউট অফ কালচার'-এ প্রায়ই বিদগ্ধ অধ্যাপকরা অসামান্য সব বিষয়ে বাগ্মিতাপূর্ণ আলোচনা করতেন। ১৯৯৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০৭-এর এপ্রিল পর্যন্ত ইন্সটিটিউট অফ কালচারে থাকাকালীন নয় বছরে তিনি ছয়টি আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং তিনটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত "Language, Thought Reality: Science Religion and Philosophy" বিষয়ে একটি চারদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার। ২০০১ সালে "Lord Mahavir and the 21st Century" বিষয়ে তিনদিনব্যাপী একটি

আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং যথাক্রমে ২০০২, ২০০৪ ও ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত Consciousness বিষয়ক তিনটি আন্তর্জাতিক সেমিনার। মহারাজ এই সময়পর্বে Consciousness নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত হয়েছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতে থাকতেন। বড় বড় অধ্যাপকেরা গোলপার্ক মিশনে এলে মহারাজ তাঁদের সামনে জিজ্ঞাসুর আবেদন নিয়ে এই প্রসঙ্গে কথা বলতেন। তাই এই বিষয়টিকে নিয়ে তিনি তিনটি সেমিনারের আয়োজন করেন, বিষয়টিকে দেখার দৃষ্টিকোণ হয়তো প্রতিবারে বদলে বদলে যেত। কিন্তু সাধারণভাবে সকলে বুঝে উঠতে পারতো না বারংবার একই বিষয়ে আলোচনা হওয়ার তাৎপর্য কোথায়। ঘটনাটিতে মহারাজের তীব্র জ্ঞানতৃষ্ণা ও বিদ্বৎজনের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনও হয়েছে এই বিষয়ের একই বক্তা দুবার বক্তৃতা দিতে এসেছেন। এমন করার কারণ হিসাবে তিনি বলতেন, "হয়তো এতদিনে গবেষণা করে নতুন কিছু তত্ত্ব বা তথ্য পাওয়া গেছে।" সেমিনারগুলির প্রায় সব কটিই অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা-বিভাগের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে এবং কয়েকটি সেমিনারের আলোচিত বিষয়বস্তু পরে পুস্তক আকারে ওই প্রতিষ্ঠানেরই প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমা সম্পর্কিত তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও তাঁর সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, যথা: "মায়ের চিঠি: শ্রীমা সারদাদেবীর মুখনিঃসৃত পত্রসংকলন", "সারদা অনুধ্যান" ও "শ্রীমাভাষিত"।

যুবসম্মেলন ও ভক্ত-সম্মেলনে নিজে দুচার কথা বলে সকলকে উৎসাহিত করতেন। ইন্সটিটিউটের স্কলার, শিক্ষক, সাধু-ব্রহ্মচারী, অতিথি, কর্মিবৃন্দ তাঁর দরদী মনোভাবাপন্ন ব্যবহারে অতি আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। মহারাজ ইন্সটিটিউটের কর্মীদের জন্য মেডিক্লেম চালু করেছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা এমনি ছিল যে আশেপাশের মানুষজন তাঁকে দেখেই শিখে নিতে পারতো কী করণীয় আর কী নয়। উপদেশ দেওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি বলতেন, "শরৎ মহারাজের একটি কথা—আমি স্কুলের হেড মাস্টারের মতো লাঠি হাতে নিয়ে বসে থাকতে পারবনা।"

গোলপার্কের সম্পাদক থাকাকালে বছরে পাঁচটি 'Symposium'-এর আয়োজন করতেন। ঠাকুর, মা, স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগীসন্তান ও গৃহীসন্তানদের উপর কোনো বিষয়ে একঘণ্টার এই আলোচনা সভা হতো। মহারাজ যুবক সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকে পাঁচ জনকে বেছে নিতেন বক্তা হিসেবে। প্রত্যেকে দশ মিনিট করে বলতেন, আর মহারাজ শেষে বলতেন দু-তিন মিনিট। এই সমগ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য বক্তা, লেখক তৈরি করা। আবার কেউ ভাল বক্তৃতা দিলে বা লেখালেখি করলে তাকে সামান্য কথায় প্রশংসা করে উৎসাহিত করতেন। গুণগ্রাহিতা ছিল তাঁর মধ্যে সহজাত।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর ধারা অনুসরণ করে মহারাজ গোলপার্কে নিয়মিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ওপর ক্লাস নিতেন। শুধু ভক্তির দৃষ্টিতে নয়, গবেষণামূলক বৌদ্ধিক মাত্রায় যে অভিনব শৈলীতে তিনি কথামৃত আলোচনা করতেন, তা বিস্ময়কর। যারা সেই ক্লাস করেছে, তারা আজও সেই সাক্ষ্য দেয়। অন্য একটি ঘটনা স্মরণ করলে হয়তো এহেন প্রতিভার কোনো উৎসসূত্র খুঁজে পেতে পারি। ব্রহ্মচারি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে থাকাকালীন সেই কেন্দ্রের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী

স্বামী শাশ্বতানন্দজীর কাছে কথামৃত-পাঠ মহারাজের জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই বিবিধ বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন বলে, বেশ কিছু ক্লাস থেকে তাঁর অব্যাহতি ছিল। মহারাজ এবং আরও দু-একজনকে ঘরে ডেকে শাশ্বতানন্দজী কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন দুপুরের দিকে। সেই সময়ের স্মৃতিচারণায় প্রভানন্দজীকে বলতে শোনা গিয়েছে, শাশ্বতানন্দজী কথামৃত পড়াবার সময় একদিন এমন একটি কথা বলেন, যার ফলে সাতদিন ধরে তাঁর মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ খেলা করে বেড়াত। ওই সময়ে মহারাজের এই অনুভূতি এত প্রগাঢ় হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে এলেই ঘটনাটি তাঁর মনে পড়তো।

সম্পাদক হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ এবং পরিশ্রমী ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দিকেই ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যে কোনও কথা তিনি খুবই ধৈর্য নিয়ে শুনতেন। যে কথা বা যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেন গ্রহণযোগ্য নয় সেটাও তিনি অত্যন্ত ভাল করে বুঝিয়ে বলতেন। তিনি গবেষণা বিভাগকে তাঁর মনের মতো করে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কলকাতায় অবস্থিত দূতাবাস অথবা বড় নামজাদা প্রতিষ্ঠানগুলি যে পাঠক্রম ও পরীক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে, তার কিছু কিছু গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু তো তিনি নামে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন না, তিনি সর্বাঙ্গীণ অর্থে ছিলেন, একজন অভিভাবক। ইন্সটিটিউট অফ কালচারের আর্কাইভস্-এর সঙ্গে যুক্ত এবং স্বামীজী বিষয়ে বিখ্যাত গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও গবেষণা-সহচর সুনীলবিহারী ঘোষ হঠাৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁর সন্তানেরা বিদেশে বাস করতেন, তিনি কার্যত এখানে একা। তাঁর দ্রুত শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন। তাঁর বাড়ির কাছের একটি বড় বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার আয়োজন চলছে, সেই সংবাদ প্রভানন্দজীর গোচরে আসে। তিনি সুনীলবাবুকে নিজের ঘরে ডেকে, সব শুনে, নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন যে ঐ বেসরকারি চিকিৎসালয়ে নয়, চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত কিছু সেবা প্রতিষ্ঠানে হবে এবং সেটি কে করবেন তাও বলে দিলেন। এরপর যা ব্যবস্থা করার সব প্রভানন্দজীই করেছেন। চিকিৎসা চলাকালীন প্রায় প্রত্যহ খোঁজখবর তো নিয়েছিলেনই, এমনকি নিজে দেখতেও গিয়েছিলেন।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী 'The Cultural Heritage of India' বইয়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড দুটি প্রকাশ করেন। প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রভানন্দজী মহারাজের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান, আট খণ্ডের বিখ্যাত বই 'The Cultural Heritage of India'-র বাকি খণ্ডগুলির প্রকাশের উদ্যোগ। সেই সময় এই গ্রন্থ প্রকাশে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছিল। প্রভানন্দজী দিল্লির প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. কপিলা বাৎস্যায়ন-কে এই বইয়ের সপ্তম খণ্ড সম্পাদনার ভার ন্যস্ত করেন। প্রভানন্দজীর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং ইচ্ছার ফসল এই বইয়ের শেষ খণ্ডগুলি।

প্রভানন্দজী ইন্সটিটিউটের দায়িত্ব নেওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যে স্বামীজী সম্বন্ধে অনুধ্যানের জন্য ছাত্র-যুবাদের নিয়ে 'বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল'-এর পাশাপাশি 'বিবেকানন্দ অনুশীলন' নামে একটি যুব বিভাগ চালু করেছিলেন। তাঁর খুবই ইচ্ছে

ছিল, এখানে এসে যুবকরা ধ্যান ও অধ্যয়ন করবেন। তাঁর অনুমোদনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবধারাকে অনুসরণ করে সরলভাবে একটি সমবেত ধ্যান-পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে বর্তমানে বেলুড় মঠের মূল কার্যালয় থেকে শাখাকেন্দ্রের ইয়ুথ সেলগুলির জন্যে এই ধ্যান-পদ্ধতিটিই পাঠানো হয়েছে। 'বিবেকানন্দ অনুশীলন'-এ মাসে দুদিন দুঘণ্টা করে ক্লাস হতো। স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা এবং ধ্যান দিয়ে এই ক্লাসের সমাপ্তি হতো। যারা এই ক্লাসে আসত, সবাই নিজেদের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। নিজেদের পরিসরে ছোট ছোট স্টাডি সার্কেল আয়োজন করে তারা বিভিন্ন সেবাকাজে যুক্ত ছিল। এই নিবেদিতপ্রাণ ছেলেমেয়ের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদেরকে সেবার পথে শিক্ষাগ্রহণের কাজে উদ্বুদ্ধ করার নেপথ্যে ছিলেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ।

এই বিপুল প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, অসামান্য নৈতিকতাবোধ, বিদ্যোৎসাহ প্রভৃতির অন্তরালে তাঁর মন ছিল সরল কিশোরের মতো। তিনি নারকেলের সন্দেশ খেতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর জন্য কোনো ভক্ত বানিয়ে আনলে একটি নিয়ে বাকিটা সবাইকে দিয়ে দিতেন। আবার বলতেন, "তোমরা সব খেয়ে নিও না, আমার জন্য একটা দুটো পারলে রেখো।" তিনি ছিলেন মিতাহারী। সেই ভক্তের কাছে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভক্তটি অতীব আনন্দে পাঁচ রকম নিরামিষ পদ রেঁধে আনলেন। সেখান থেকে যৎসামান্য মুখে দিয়ে অন্য সাধুদের তিনি সেটা দিয়ে দিলেন। রান্নার খুবই সুখ্যাতি করলেন। কিন্তু পরে সেই ভক্তকে বললেন, "আমি তো আসলে এত কিছু খেতে চাইনি। চেয়েছিলাম, নারকেলের সন্দেশ খেতে।"

একজন অত্যন্ত স্বনামধন্য সাইকোলজির অধ্যাপিকা তথা প্র্যাকটিসিং সাইকোলজিস্ট তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, মহারাজ তাঁর সাথে আলোচনা করতেন নতুন তথ্য নিয়ে, অনেক সময় রেফারেন্স আর্টিকেল জেরক্স করে পড়তে দিয়েছেন। পড়ার পর সেই বিষয়ে আলোচনাও করতেন। এই অধ্যাপিকা যখন দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন, মহারাজ তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন যে, দীক্ষা নিলে মনঃসমীক্ষণের অভ্যাসে কোনও অসুবিধা হবে না তো!

একদিন দুপুরে মহারাজ খুব অসুস্থ। অনর্গল রক্ত বমি করছেন। ডাক্তারদের ঐকান্তিক চেষ্টায় রক্তবমি থামল। সবাই ভাবছেন, এখন উনি অত্যন্ত অসুস্থ, বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। এক পরিচিত তাঁর শরীরের অবস্থা জানার জন্য ঘরে ঢুকে দেখেন, তিনি চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে একটি বই পড়ছেন! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, ওবেলা আপনার শরীর খুব খারাপ হয়েছিলো, আপনি এখন পড়াশুনা করছেন?" মহারাজ উত্তরে অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, "ওরা ছোট ছেলে, এইসব দেখে ভয় পেয়েছে, আমি ডাক্তারি পড়িনি বটে, কিন্তু ডাক্তারির অনেক বই পড়েছি।" এই বলে রক্তবমির কার্য-কারণ সব বুঝিয়ে সেই ব্যক্তিকে বললেন, যে ভয় পাওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। মহারাজের নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় মনোভাব দেখে ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

কাজকর্মে কুশলী মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত methodical। সময় ব্যবহারের কৌশল জানতেন বলেই, ইন্সটিটিউটের বিশাল কর্মভার সামলেও চলে যেতেন বেলুড় মঠে মিউজিয়ামের কাজকর্ম দেখতে কিংবা Complete Works of

Swami Vivekananda-এর কাজ সংক্রান্ত মিটিং করতে। সেইসঙ্গে তাঁর নিজস্ব পড়াশুনা আর লেখালেখি তো ছিলই।

এরপর ২০০৭-এর ২-রা মে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পূজনীয় মহারাজের এই পর্বটিও ছিল তাঁর কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়নের সযত্ন প্রযত্নে ভাস্বর।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস ১-লা মে পালিত হয়ে আসছিল অনেকদিন ধরে বলরাম বসুর বাড়িতে। পূজনীয় মহারাজ সাধারণ সম্পাদক থাকার সময়েই বিকেলে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণেও ঐ দিন উপলক্ষে একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়েছিল।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর বরাবরের মত বজায় ছিল। তাঁরা যাতে সঙ্ঘের মূল ঐতিহ্য, আদর্শ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারে, সেই কারণে সঙ্ঘের অনেক প্রবীণ সাধুদের নিয়ে এসে বক্তৃতা দেওয়াতেন, পুরানো দিনের সাধুদের স্মৃতিকথা শোনানোর ব্যবস্থা করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিন বছর ব্যাপী যে নানা কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল, তার পুরোটাই ছিল পূজনীয় মহারাজের মস্তিষ্ক প্রসূত। কেবলমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠান না করে এই উপলক্ষে যাতে কিছু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। তাই গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্প, সারদা পল্লীবিকাশ প্রকল্প, বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প এবং অখণ্ডানন্দ সেবাপ্রকল্প নামে চার ধরনের সেবাকাজের কথা ভাবা হয়েছিল। এই সব কয়টি প্রকল্প সারা দেশ জুড়ে পালিত হয়েছিল। প্রকল্পগুলি তৈরীর সময় তিনি নিজে যেমন পরিশ্রম করেছেন তেমনি অনুজ সাধুভাইদের পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করেছেন। এরকমই এক দুপুরে এই সংক্রান্ত কাজ করতে করতে একজন সাধুভাই খাওয়ার সময় পার করে কাজ করে চলেছেন দেখে নিজের খাবার থেকে কিছু অংশ তুলে তার সামনে এনে ধরেছেন।

সেই সময়ের সহ-সম্পাদক বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে, যখন এই প্রকল্পগুলি নিয়ে সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর সঙ্গে মিটিং করা হলো, তখন ডঃ সিং পাঁচ মিনিট পূজনীয় মহারাজের কথা শুনেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দিলেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করতে যেন পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক থাকার সময়ে শাখাকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও ভালোবাসা ছিল শিক্ষণীয়। শাখাকেন্দ্রে গেলে যত অসুবিধাই হোক না কেন তিনি সেসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, বরং সেখানকার অনুষ্ঠান যেমন করেই হোক সম্পন্ন করে আসতেন। এক্ষেত্রে তাঁর পরম ঈশ্বরনির্ভরতার পরিচয়ও পেয়েছেন অনেকে। ২০১০ সালের এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী। সেবার মহারাজ গেছেন শিলং, চেরাপুঞ্জী এবং শেলা প্রভৃতি স্থানের আশ্রমগুলি দেখতে। শেলাতে একটি ছোট্ট ঘরে মহারাজের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। শেলাই

ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতে এই ভাবাদর্শের সূতিকাগৃহ। শেলার অনুষ্ঠান শেষ করে পূজনীয় মহারাজের ফেরার কথা ছিল পরের দিন চেরাপুঞ্জীতে আর একটি অনুষ্ঠানে। কিন্তু পরের দিন সকালে সেখানে হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে। আশ্রমগৃহ থেকে গাড়ি যাবার রাস্তায় পৌঁছাতে গেলে অনেকগুলি খুব খাড়া পাহাড়ী সিঁড়ির মত ধাপ পেরোতে হবে। সেইসময় ঐ অঞ্চলে ফোনের ব্যবস্থাও তেমন নেই। হঠাৎ দেখা গেল, পূজনীয় মহারাজ একজন শ্রমিকের রেইনকোট পরিধান করে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছেন। সঙ্গে থাকা সাধুরা তো বিশ্বাসই করতে পারছে না যে এমন ঝুঁকি কেউ নিতে পারে। যাই হোক মহারাজ শেষ পর্যন্ত গাড়ি যাওয়ার রাস্তাতে উঠে পড়লেন। তারপর গাড়িতে উঠে উপস্থিত সাধুদের মনের কথা আঁচ করতে পেরে মহারাজ বললেন যে কিছু বছর আগে এই শেলা-চেরাপুঞ্জীতেই একবার রাস্তা দিয়ে তাঁরা যখন গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ করে দুটি বড় পাথর পরের পর রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে এমনভাবে রাস্তা আটকে দেয় যে তাঁরা না এগোতে পারছেন, না পেছোতে পারছেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া তাঁদের কোন উপায় ছিল না। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটি পাথর সরানোর গাড়ি এসে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাঁরাও উদ্ধার পান। এই ঘটনা বলে পূজনীয় মহারাজ একটু থেমে বলেন, "তোমাদের কি মনে হয় না যে আজকের ব্যাপারটা ওটার চেয়ে একটু কমই ভয়ানক ছিল ?" সঙ্গের সাধুরা তখন প্রসন্ন বিস্ময়ে স্তব্ধবাক্।

২০১২ সালের ৬-ই মে-তে পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই পূজনীয় মহারাজের মধ্যে গুরুশক্তির অপূর্ব বিকাশ হতে দেখা যায়। প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ উদ্ভাবন-ক্ষমতা আর গবেষণামূলক মননশীলতার জন্যে যে মানুষটি দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে কাছের-দূরের অনেক মানুষের কাছে, দেশ-বিদেশের বহু গুণীজনের কাছে শ্রদ্ধার্হ হয়ে উঠেছিলেন, এই পর্বে গুরুশক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে তিনিই হয়ে উঠতে লাগলেন আধ্যাত্মিক জগতের জিজ্ঞাসুদের কাছে পরম আশ্রয়। কাছের কলেজ বিদ্যামন্দিরের অনেক ছাত্রকেই এই পর্বে দেখা যেত তাঁর কাছে ছুটে যেতে। পূজনীয় মহারাজের অপূর্ব কৃপাময় ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে আকৃষ্ট হয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে তারা আজ বেশ কয়েকজন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছে।

ঐ কলেজে পাঠরত এমনই এক কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানের জন্মদিনের খবর পেয়ে তিনি তাকে ডেকে পাঠান। জিজ্ঞাসা করেন, "বলো, তোমার কী গিফ্‌ট্ চাই ? তুমি যা চাইবে আজ আমি তাই দেবো।" আবেগভরে ছেলেটিও নিজের মাথাটি পূজনীয় মহারাজের কোলের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, "মহারাজ আজ আমি এই গিফ্‌ট্ চাই যে যেন সারাজীবন এভাবে আপনার আশ্রয়ে আমার মাথা থাকে এবং আপনার হাত আমার মাথায় থাকে।" শুনে পূজনীয় মহারাজও বলে ওঠেন, "আমি প্রাণভরে তোমায় আশীর্বাদ করছি।"

একবার তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত এক সন্তান তিনি বাঁকুড়া মঠে দীক্ষা দিচ্ছেন যখন, তখন বিশেষ কাজের জন্যে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। সে তখন রামকৃষ্ণ

সঙ্ঘে যোগদান করেছে এবং একটি শাখাকেন্দ্রে রয়েছে। সে ভেবেছিল অনেকদিন আগে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সুতরাং পূজনীয় মহারাজ নিশ্চয়ই তাকে অতটা মনে রাখতে আর পারেন নি। সেই প্রসঙ্গ সে তুলতেই, মহারাজ হেসে উঠে বললেন, "এখন আমি অনেক কিছু ভুলে যাই ঠিকই, কিন্তু এতটাও ভুল হয় নি যে, তোমাকে মনে রাখতে পারবো না।"

পূজনীয় মহারাজ বাগবাজার মায়ের বাড়ীতে তাঁর মন্ত্রদীক্ষা প্রদান শুরু করেন ২৯.৬.২০১২। আবার ২৫.৬.২০২২ তারিখে মায়ের বাড়ীতেই তিনি শেষ মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। এছাড়া কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া, রামহরিপুর, আঁটপুর, তমলুক, নরেন্দ্রপুর, জামসেদপুর, গোলপার্ক, শিলচর (আসাম), রহড়া, রাজারহাট বিষ্ণুপুর, সারগাছি, নাওড়া, বরোদা (গুজরাট), রাজকোট (গুজরাট), বারাসাত, শিলং (মেঘালয়), গুয়াহাটি (আসাম), আগরতলা (ত্রিপুরা), বলরাম মন্দির, পুরুলিয়া, মঠ চণ্ডিপুর, কন্টাই, তিনসুকিয়া (আসাম), ডিগবয় (আসাম), নরোত্তমনগর (অরুণাচল প্রদেশ), ত্রিসুর (কেরালা), কালাডি (কেরালা), ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক), মালদহ, চেরাপুঞ্জী (মেঘালয়), বরানগর মিশন, যোরহাট (আসাম), আসানসোল, দেওঘর (ঝাড়খণ্ড), শ্যামপুকুর বাটি, লক্ষ্ণৌ (উত্তরপ্রদেশ), শিকড়া-কুলিনগ্রাম, বামুনমুড়া, যোগোদ্যান, পুতুণ্ডা, ডিমাপুর (নাগাল্যাণ্ড), বরিষা, মুম্বাই (মহারাষ্ট্র), চন্দননগর, পাটনা (বিহার), মেদিনীপুর, নিমপীঠ, সোমসার, আন্দামান (পোর্টব্লেয়ার)-এ মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করে বহু মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে দেন। দেশের বাইরে, যেমন বাংলাদেশের যশোর ও চট্টগ্রামে এবং নেপালের কাঠমাণ্ডুতে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, রাশিয়া, ফিজি, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শনে যান এবং বেদান্ত দর্শন সহ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করেন। সর্বমোট প্রায় ৪০৪০৯ জন ধর্মপিপাসুকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। নিজেই তিনি বলতেন সেবকদের যে, ৪০০০০ পেরোবার পরেই তিনি থেমে যাবেন। সত্যদ্রষ্টা নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর কথা ভুল হয় নি।

দীক্ষার আগের দিন মহারাজ দীক্ষার্থিদের তালিকা ও ফর্মগুলি খুটিয়ে দেখতেন। কতজন পুরুষ, কতজন মহিলা, সব থেকে ছোট কে, কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সর্বোপরি কেন দীক্ষা নিতে চাইছেন। দীক্ষার দিন তিনি আগে মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজকে অর্ঘ্য দিয়ে দীক্ষাগৃহে সাজানো শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীকে পুনরায় অর্ঘ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতেন। বলতেন, "আমি তাঁদের তোমাদের কথা বলে এলাম, আবার সব হয়ে যাবার পর তাঁদের কাছে গিয়ে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবো। যাতে তোমাদের সমস্ত ভার তিনি লন।" শেষে আবার তিনি অর্ঘ্য দিয়ে ঘরে যেতেন। আশ্রমে দীক্ষার শেষদিন ভক্তদের উদ্দেশ্যে একটু ভাষণ দিতেন। তাতে শ্রীশ্রীমায়ের কথা এবং ধর্মজীবনের বিশেষ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন।

নিজের দীর্ঘ সঙ্ঘজীবনে অনেক বরেণ্য সাধুর সঙ্গ করেছেন পূজনীয় মহারাজ। তাঁদের উজ্জ্বল স্মৃতি তাঁকে ধন্য করেছে যেমন, সেই ধন্যতাকেই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐতিহ্যরূপে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। এরই সঙ্গে জুড়েছিল তাঁর অপূর্ব

তপস্যাপূত জীবন। একদিকে সাধুমহাত্মাদের সঙ্গলাভ আর একদিকে তপস্যা তাঁর জীবনকে নিয়ে গিয়েছিল সেই উচ্চতায় যা উত্তরকালকে আকর্ষণ করবে আধ্যাত্মিক সাধনার মহত্বে, প্রেরণা যোগাবে চিরকাল আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে যাত্রায়। কাছের মানুষদের, বিশেষ করে সেবকদের কাছে নিজের সেই অনন্য স্মৃতির ভাণ্ডার কখনো কখনো উন্মুক্ত করেছেন পূজনীয় মহারাজ জীবনের শেষ পর্বে। তারই কিছু অংশ এখানে আমরা তুলে ধরতে পারি, "খুব ভুগতাম বলে হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ একটু মায়ের চরণ রজ দিয়ে আমায় বললেন, যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে এটি মাদুলীতে ভরে গলায় সর্বদা রেখো। মায়ের কৃপায় সব হতে পারে। এখনো সেটি আমার গলায় রয়েছে এবং ভালই আছি।"

"স্বামী শান্তানন্দজীও আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর অনেক সঙ্গ পেয়েছি। তিনি তখন রাঁচি মোরাবাদী আশ্রমে থাকতেন। তিনি অনাহত ধ্বনি শুনতে পেতেন। ভাবতেন সবাই বুঝি শুনতে পায়। একদিন আমায় বললেন, আমি এইরকম একটা শব্দ শুনতে পাই, তুমিও শুনতে পাও নিশ্চয়ই। আমি বললাম, না মহারাজ আমি শুনতে পাই না। বললেন, চেষ্টা কর তুমিও পাবে। একবার হিমালয়ে তপস্যায় যাবার কথা তাঁকে বলতেই তিনি বললেন, যাও খুব তপস্যা লাগাও তুমিও নিশ্চয়ই এই ধ্বনি শুনতে পাবে। তবে একটু দুধ খাবে। শরীর ঠিক রাখতে হবে। তা না হলে তপস্যা করতে পারবে না। বলে একটি দশটাকার নোট আমায় দিলেন। কত কথা তাঁর সাথে হয়েছিল!"

"পরবর্তীকালে যতীশ্বরানন্দজীর সাথেও অনেক তত্ত্বকথা আলোচনা হয়। তিনিও খুব ভালবাসতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও ঘটনার কথা তিনি আমায় বলেন। সাধু জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথাও আমাকে বলেন। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনার পর হাতে একটি চকলেট দিলেন এবং ঘরে বসিয়ে খাওয়ালেন। তাঁর সাথে যে সব কথা হয় তা আমার ব্যক্তিগত জীবনের মূলধন হয়ে রয়েছে।"

"তখন খুব সাধু দর্শন করে বেড়াতাম। অনেক পুরানো সাধু দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ডাচ্ স্বামী অতুলানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন বার্লোগঞ্জে থাকতেন। তাঁর সাধুজীবন খুবই বৈরাগ্যব্যঞ্জক।"

"আমি তখন নরেন্দ্রপুরে ব্রহ্মচারী। একটি অফিসিয়াল কাজে আমাকে বেলুড়মঠে পাঠানো হয়। একটি চিঠি তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের হাতে দিয়ে আসতে হবে। বেলুড়মঠে পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে গেল, এদিকে প্রচণ্ড রোদের তেজ ও তেমন গরম। ঘেমে গেছি। প্রভু মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম করে চিঠিটা দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের সামনে তখন মিশন অফিস। তিনি আমাকে একটু বসতে বলে একজনকে মন্দির থেকে একটু বরফ আনতে পাঠালেন। তখন বোধ হয় একমাত্র মন্দিরে একটি ছোট ফ্রিজ ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বরফ আনলে। দেখলাম তিনি নিজেই কুঁজো থেকে জল ও আরও কি সব নিয়ে দুটি গ্লাসে ঢালাঢালি করছেন। এরপর আমাকে ডেকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে বললেন, খুব ঘেমে গেছো, এই

সরবৎটুকু খেয়ে নাও। আমি তো অবাক! খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কোথায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী আর আমি দু-দিনের ব্রহ্মচারী! এমন মানুষ ছিলেন তিনি।"

"পরবর্তীকালে তিনি অনেক জায়গায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। একবার বোধহয় চেন্নাইয়ে তাঁর সঙ্গে গেছি। কোন একটা অনুষ্ঠান ছিল। তিনি বক্তৃতা দিলেন। সেখানের এক সাধু প্রভু মহারাজের কাছে এসে বক্তৃতার কপি চাইলে তিনি বললেন, আমার কাছে তো কোন কপি নাই। আমাকে ডাকলেন, বললেন, বরুণ এরা কপি চাইছে। আমার কাছে কোন কপি নাই। তুমি তো শুনেছো, একটা কাগজে একটু লিখে দাও তো। আমি লিখে মহারাজকে দেখতে দিলাম। তিনি দেখে বললেন, তুমি কি নোট করেছিলে নাকি? আমি বললাম, না মহারাজ। যেটুকু মনে আছে তাই লিখেছি। তিনি দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। এরকম ঘটনা আরও কয়েকবার হয়েছে। সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হবার পরও তাঁর কঠোর জীবন বড়ই প্রেরণাপ্রদ।"

"স্বামী শঙ্করানন্দজীকে তখন সবাই ভীষণ ভয় পেতেন। আমার কিন্তু কোন ভয় হত না। তিনিও আমাকে খুব ভালবাসতেন। যখন ট্রেনিং সেন্টারে আছি, আমি প্রত্যহ তাঁর ঘরে গিয়ে কাগজ পড়ে শোনাতাম ও তাঁর সাথে কত গল্প করতাম। এই ছিল আমার কাজ। আমাকে কোনো ক্লাস করতে হতো না। কিন্তু পরীক্ষা দিতে হতো, ফল খারাপ হতো না।"

"একবার কাজে ছুটি নিয়ে হিমালয়ে আলমোড়া আশ্রমে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলাম। শ্যামলাতাল আশ্রমেও একবার বেশ কিছুদিন ছিলাম। একটু বেশী সাধন-ভজনের ইচ্ছা। যাইহোক, আলমোড়ায় থাকাকালীন এক ঘটনা। বইয়ে পড়েছি শ্রীশ্রীমা নাকি দিনে এক লক্ষ জপ করতেন। হিসাব করে বোঝা যাচ্ছে না তা বাস্তবিক সম্ভব কিনা। তবে মা যখন বলেছেন তা মিথ্যা হতে পারে না। তাই ঠিক করলাম এক লক্ষ করে জপ করা যায় কিনা দেখতে হবে। আমার দীক্ষা স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাউকে জপের মালা দেননি, কর গুণেই জপ করতে বলতেন। আমিও করেই জপ করি। সংখ্যা রাখার সুবিধার জন্য কতকগুলি পাথরের টুকরা নিয়ে বসতাম। এক লক্ষ জপ করতে আমার ১৮-১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত লাগত। পরে বোধহয় ১৬-১৭ ঘণ্টার কমে হতো না। তা বেশ কয়েকদিন এভাবে চলার পর আমার হাত দুটি ফুলে গিয়েছিল। প্রভু মহারাজ তা জানতে পেরে আমাকে একটি চিঠি ও একটি ৫৪ দানার রুদ্রাক্ষের মালা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন, স্বামী শঙ্করানন্দজী মালা না দিলেও আমি তোমায় বলছি, এই মালায় সংখ্যা রেখে জপ কোরো। বেশী সংখ্যক জপ করতে হলে করে (হাতে) তা সম্ভব নয়। মালায় কোরো। সেই থেকে আমার মালা জপ।"

অমূল্য এই স্মৃতিকণাসমূহ। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এ কেবল মনন আর ধ্যানের বস্তু।

নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা প্রায় কখনই কিছু মুখ ফুটে বলেননি। কখনো কথার ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে এই মহান জীবনের অন্তর্লোকের উপলব্ধির

মণিদীপ্তি। সঙ্ঘের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেন যে রাজা মহারাজের জীবনীগ্রন্থটি লেখার সময় তিনি রাজা মহারাজের দর্শন পেয়েছিলেন। কৃপাপ্রাপ্ত এক সন্তানের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, "একবার কেদার বদ্রী দর্শনে যাই সেখানে এক অদ্ভুত দর্শন হয়। শুনে কেউ কেউ বলে সেটা নাকি শিবভক্ত নন্দী। অনেকেই তাঁর দর্শন পায়।" শরীর খারাপ অবস্থায় পূজনীয় হিরণ্ময়ানন্দজীর নির্দেশ অনুযায়ী মায়ের কিছু 'স্মৃতি' সমন্বিত একটি মাদুলি ধারণ করে সুস্থ হয়েছিলেন। একদিন এক সন্ন্যাসী যখন বলেন যে তাঁর বইগুলির মধ্যে সারদানন্দ-চরিত সেরা, তখন তিনি ঐ মাদুলিধারণের কথা উল্লেখ করে বলেন, "এটি ব্যবহার করে সুস্থ হবার পর মনে হলো শ্রীশ্রীমাকে কিছু উপহার দিই। অনেক ভেবে তাই সারদানন্দ-চরিত লেখা হলো। ...জানতো এটি লেখার সময় আমি মায়ের প্রসন্ন মুখটি চিন্তা করতাম।" লক্ষ্ণৌতে ভয়ানক শারীরিক অসুস্থতার মুহূর্তে মা তাঁকে স্বয়ং এসে রক্ষা করেছিলেন, এই আভাস তিনি দিয়েছিলেন।

পূজনীয় মহারাজের একাগ্রতা ছিল গল্পের মতো। বাবুরাম মহারাজের একটি বই লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজীর সম্পর্কে যে সকল বই পাওয়া যায় তার সবগুলি তিনি পড়েছিলেন। আবার গবেষণার জন্য কোন কোন জায়গায় গিয়ে নিজের চোখে স্থান পরিদর্শনের পরিকল্পনাও তাঁর থাকতো। সে সময় একদিন একটি কাজ নিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়েছেন সেবক। তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে করে ডেকেছেন একবার-দুবার। কিন্তু তাঁর কোন হুঁশ নেই। এভাবে দু-তিনবার হবার পর তিনি যখন শুনলেন, অবাক হয়ে সেবককে বললেন, "তুমি এসেছিলে নাকি?" একই রকম ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে আরো অনেকে।

নিয়মিত সাধন-ভজনে তাঁর কোন ছেদ পড়তে কেউ কখনো দেখেছে বলে শুনিনা। একভাবে সোজা হয়ে দুই ঘণ্টা বসে জপ-ধ্যান করতেন। যখন শুয়ে থাকতেন তখনও দেখা যেত হাতে কর গোনা চলছে। ঘুমের মধ্যেই জপ চলত।

পূজনীয় মহারাজের রুটিন লাইফ ছিল দেখার মতো। ভোর সাড়ে তিনটায় উঠে মন্দিরে যেতেন। সওয়া পাঁচটায় ঘরে ফিরে এসে স্নানাদি সেরে হাঁটতে হাঁটতে সব মন্দিরে প্রণাম করে কখনো কখনো নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়ী (পুরানো মঠ) গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসতেন। ছয়টা কুড়ি নাগাদ ঘরে পৌঁছে যেতেন। ঠিক সাড়ে ছটায় ডাক্তার বক্সীকে ফোন করে কুশল সংবাদ নিতেন। তারপর লেখাপড়া করতে করতেই এই সব ফোন সেরে টিফিনে বসতেন। তাঁর খাওয়া ছিল খুবই অল্প। তাই সময় লাগত খুবই কম। খানিকটা লেখাপড়া করে আটটা পনেরো নাগাদ অফিসে চলে যেতেন। প্রত্যেকটি কাজই ছিল সময়ের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে। এরই মধ্যে তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার আরোগ্যভবনে গিয়ে বৃদ্ধ সাধুদের এবং সেবা প্রতিষ্ঠানে অসুস্থ সাধুদের দেখে আসতেন। কোন সাধু অসুস্থ হলে তিনি যেখানেই থাকুন নিয়মিত খোঁজ নিতেন। এর মধ্যেই চলতো রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দিরের কাজ।

সঙ্ঘের আদর্শকে ধরে সারা জীবন চলেছেন। কখনো কোন আপোস করতে তাঁকে দেখা যায়নি। সঙ্ঘগতপ্রাণ ছিলেন তিনি। এই সঙ্ঘের মধ্য দিয়েই দর্শন করেছেন সচল-জীবন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে, শ্রীমাকে, স্বামীজীকে। একটি সাধু-সমাবেশের

শেষে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন, "মনে রেখো, ঠাকুর-মা-স্বামীজী-আর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই – এই সত্তা-চতুষ্টয়কে উপলব্ধির সাধনা এযুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা।" সঙ্ঘগুরুকে এবং প্রবীণ সন্ন্যাসীদের খুব সম্মান করতেন তিনি। তিনি তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার ষষ্ঠির বোধনের পূজা চলছে। পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এসে বসেছেন। পূজনীয় প্রভানন্দজীর বসার জন্য চেয়ারটি প্রেসিডেন্ট মহারাজের পাশে একটু দূরে রাখা হয়েছে। মহারাজ এসে প্রণাম করে প্রেসিডেন্ট মহারাজের পেছন দিয়ে এসে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটি টেনে বেশ খানিকটা পেছনে সরিয়ে এনে বসলেন। একলাইনে বসলেন না।

কেউ কোন জিনিস তাঁকে দিতে এলে তিনি প্রয়োজন না হলে গ্রহণ করতেন না। একবার এক ভক্ত মহারাজকে একজোড়া জুতো কিনে দিতে চাইলে তিনি রাজী হননি। পরে একদিন দোকান থেকে অনেক ভাল ভাল বিভিন্ন রকম জুতো নিয়ে একজন লোক-সহ এসে হাজির। মহারাজকে বললেন, "মহারাজ আপনার পায়ে কোন জুতোটি হয় একবার দেখুন তো। এ জুতোগুলি সব বিদেশী, খুবই আরামপ্রদ।" মহারাজ একই কথা তাঁকে বললেন, "আমার জুতো আছে, এখন জুতোর প্রয়োজন নেই। তুমি এ সব নিয়ে যাও।" সে খুবই জোর করা শুরু করলে মহারাজ তাঁর দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বললেন, "আমার জুতোর প্রয়োজন নেই, আমি পায়ে দিয়ে দেখবোও না। ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ।" বলে উঠে ঘরে চলে গেলেন। বিফল মনোরথ হয়ে ভক্তটি ফিরে গেলেন।

পূজনীয় মহারাজ ছিলেন স্পষ্টবাদী। একজন মহারাজকে নিজের অভিজ্ঞতার অনেক কথা বলে প্রমাণ করতে চাইলো যে তার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়েছে। এবং এটি তার নাকি মহারাজের মুখ থেকেও শোনার ইচ্ছা। মহারাজ নিজে ছিলেন সাইকোলজির মানুষ। সব শুনে তাকে স্পষ্ট বলে দিলেন যে, তার সমস্যার ব্যাপারে কোন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অথচ আপাতকঠিন এই মানুষটির মধ্যে এক অপূর্ব সরস সত্তা বিরাজ করতো সব সময়। একটু বেশী স্বাস্থ্যবান তাঁর এক স্নেহভাজন সাধুকে দেখিয়ে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে তিনি বলছেন একদিন, "দেখুন মহারাজ, এরাই সব আমাদের মঠের নয়ন-নন্দন।" আর একদিন বেশ কিছু তরুণ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন যে, একবার একটি জায়গায় খুব উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন তিনি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন তো সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলে। পূজনীয় মহারাজ যত তাকে বোঝান, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, কারণ, মহারাজের ভাষায়, 'এমন বক্তৃতার পর আর নাকি ঘরে থাকা যায় না'। তারপর মহারাজের সরস উক্তি, "কিন্তু এসে দু-একদিন পরেই যখন দেখলো, ভোরে উঠতে হবে, পড়াশুনা করতে হবে, কাজ করতে হবে, তখন আর থাকে নি, কেটে পড়েছে।" আম্ফানের ঝড়ে মঠের অনেক গাছ পড়ে গিয়েছিল। মঠের বাগান দেখেন যিনি তিনি সেগুলিকে তুলে সুন্দর করে কেটে সাজিয়ে রাখছেন। মহারাজ একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "এগুলি রাখছ কেন এভাবে?" বাগানের মহারাজ উত্তর জানালেন যে দেহরক্ষা করেন যেসব সাধুরা তাঁদের দাহকার্যের জন্যে এগুলি

কাজে লাগে, এছাড়া অন্য কাজে তো লাগেই। শুনেই মহারাজের সরস উত্তর, "আমার জন্যেও একটি রেখে দিও।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে তাঁর অবদান শুধু এই সঙ্ঘের নয়, ভারতের সাংস্কৃতিক-সারস্বত সাধনার ইতিহাসে অম্লান অক্ষরে খোদিত হয়ে থাকবে। পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যসাধনার প্রথম যুগটি যদি হয়ে থাকে স্বামী সারদানন্দজীর, দ্বিতীয় যুগটি তাহলে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর এবং তৃতীয় যুগটি অবশ্যই স্বামী প্রভানন্দজীর। বাংলা ও ইংরাজী মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা কম-বেশী ৩৪। প্রবন্ধ অসংখ্য। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, ব্রহ্মানন্দ চরিত, সারদানন্দ চরিত, রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ, অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি বাংলা গ্রন্থ, First Meetings with Sri Ramakrishna এবং Early History of Ramakrishna Movement প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থগুলি পূজনীয় মহারাজের অনন্য মেধা, কিংবদন্তীতুল্য বিশ্লেষণ আর অননুকরণীয় উপস্থাপনাভঙ্গীর জন্যে সাহিত্যের ইতিকথায় চিরকালের আসন লাভ করেছে। স্মরণীয়, তাঁরই উদ্যোগে সর্বানন্দ চৌধুরীর সম্পাদনায় গোলপার্ক থেকে স্বামীজীর (নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে) সম্পাদিত 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থটির প্রথম রামকৃষ্ণ মিশন সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তীকালের কত গবেষণার আকর হয়ে উঠেছে ও উঠবে তাঁর এই সমস্ত সারস্বত কীর্তি, আজও তা বলার সময় আসে নি।

সঙ্ঘের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী পূজনীয় মহারাজের দিব্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, সনাতন শাস্ত্র ও সন্ন্যাসের ধারাকে বজায় রেখে সমান্তরাল একটি আধুনিক যুগোপযোগী শাস্ত্র ও সন্ন্যাসের অভিনবত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে এক অভূতপূর্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারা ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, এবিষয়ে মহারাজের বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর জীবনকে এই ভাবধারার শক্তভিতের উপরে প্রোথিত করতে পেরেছিল। তাঁর মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান আর কর্ম – এই চারযোগের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। মায়ের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁকে এক মাতৃগতপ্রাণ শিশুমূর্তিতে রূপান্তরিত করতো অনেক সময়।

মহারাজের শরীর খুব পটু না হলেও মানসিক ক্ষমতার অভাব দেখা যায় নি কখনো। হজমের সমস্যা, কোমর ও হাঁটুর যন্ত্রণা দীর্ঘদিনের সঙ্গী ছিল। আয়ুর্বেদি চিকিৎসায় তার কিছুটা উপশম হলেও পরে তা আবার বাড়ে। শেষ পর্যন্ত অনেকের অনুরোধে হাঁটু অপারেশন করেন ২০১৬ সালে কোলকাতায়। ২০১৭ সালে তাঁর একটি ব্রেন স্ট্রোক হয়। তার ফলে অসুস্থতায় দিন কাটতে থাকে বেশ কিছুদিন, দীক্ষাদি বন্ধ রাখতে হয়। চিকিৎসা এবং বিশ্রামের পর আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। ২০২২ পড়তেই মহারাজের অসুস্থতা কিছুটা বাড়তে থাকে। জ্বর, ইনফেকশনাদি প্রায়ই লেগে থাকতো। জ্বর ও নিউমোনিয়া নিয়ে কয়েকবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হয়েছে তাঁকে। সুস্থও হয়েছেন এবং পুনরায় কাজ শুরু করেছেন। রাত্রে অনেক সময় তাঁর ভাল ঘুম হতো না। সেবক বলতেন, "মহারাজ আমি মায়ের গান করি আপনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ুন।" মাঝে মাঝেই জয় মা, জয় মা, বলে উঠতেন। একদিন বলে উঠলেন,

"কই মা কোথায় গেল, মা!" এইভাবে চলতে চলতে অবশেষে ১১ অক্টোবর জ্বর নিয়ে পুনরায় সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হয় মহারাজকে। এবার হঠাৎ হাসপাতালের বেডে উঠতে উঠতে বললেন, "এবার শরীর থেকে মনকে আলাদা করতে হবে।" অসুস্থতার বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে শেষে আই.সি.ইউতে যেতে হল এবং ভেন্টিলেটরের সাহায্য নিতে হল। ভেন্টিলেটরে দেবার আগে মহারাজের শেষ কথা ছিল, "কি করবো, জয় ঠাকুর, জয় মা"। এরপর ক্রমশই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। কোলকাতার সব বড় বড় ডাক্তারদের নিয়ে তৈরী হয় মেডিক্যাল বোর্ড। বাইরের চিকিৎসকদের সহায়তাও নেওয়া হতে থাকে। মাঝে কিছুটা উন্নতি হল এবং মহারাজ ভেন্টিলেটর থেকে বেরিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এলেন। কিন্তু সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে ক্রমশ বয়সজনিত কারণেও। এই সময় মহারাজের কিডনি ভাল কাজ করছিল না। ডায়ালিসিস করা হল একবার। ১-লা এপ্রিল সকাল থেকে অন্য কোনো রোগের লক্ষণ আর দেখা গেল না। জ্বর নেই, লাঙ্‌স্ পরিষ্কার, রক্তক্ষরণও বন্ধ। শুধু হাতের পালস্ রেট ও ব্লাড প্রেসার ক্ষীণ হতে শুরু করেছে। প্রতিদিনের মতো ভক্তদের প্রণাম শুরু হলো বিকালে ৫-৩০ মিনিটে। প্রণাম পর্ব শেষ হলো ৬-৪০ মিনিটে। সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে পূজনীয় মহারাজের হৃদযন্ত্র থেমে গেলো চিরকালের জন্যে।

বেলুড় মঠের মূল কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী সুবীরানন্দজী এই মহাপ্রয়াণের কথা ঘোষণা করে লিখলেন, "স্বামী প্রভানন্দজীর জ্ঞানস্পৃহা ও গবেষণাস্পৃহা সর্বজনবিদিত। তাঁর অসাধারণ মেধা, পাণ্ডিত্য, সেবাপরায়ণতা ও ত্যাগ-তপস্যাপূত জীবনের জন্য তিনি ছিলেন বহুমানিত। সর্বোপরি সঙ্ঘসেবায় তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর মহাপ্রয়াণে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক অপূরণীয় ক্ষতি হোল।" পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় জানালেন যে পূজনীয় মহারাজের প্রয়াণে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত এবং সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে তাঁদের শোকজ্ঞাপন করে বার্তা পাঠালেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর শোকবার্তায় লিখলেন, "His demise is a personal loss to me. During my interaction with him, his simplicity, humility and spiritual knowledge always left a deep impression. I consider it my good fortune to have received his blessings. When I visited the Belur Math in 2020, Swami Prabhananda Ji Maharaj had affectionately gifted me a blanket, a gesture I will never forget." সমস্ত মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হোল পূজনীয় মহারাজের মহাপ্রয়াণের সংবাদ।

ঐদিনই রাতে তাঁর পুণ্য পার্থিব শরীর বেলুড় মঠে নিয়ে এসে সাংস্কৃতিক ভবনে রাখা হলো। পরদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী পূজনীয় মহারাজকে দর্শন করলেন সারিবদ্ধভাবে। সাধু-ব্রহ্মচারীরা সারারাত আর দিনভর কখনো ভগবৎগীতার পবিত্র শ্লোকাবলী, কখনো স্তোত্রাবলী উচ্চারণ করে চললেন সমবেতভাবে। রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে ভোগ নিবেদনের পরে পূজনীয় মহারাজের পূতদেহ নিয়ে সাধু-ব্রহ্মচারীরা এনে রাখলেন বেলুড় মঠের স্বামীজীর

ঘরের সামনের প্রাঙ্গণে। তারপর সমস্ত মন্দির ঘুরে যথাবিধি তাঁরা পৌঁছে গেলেন সমাধিপ্রাঙ্গণে। তখনও মঠে অগণিত ভক্তদের ভিড়। মাঝে মাঝে শুধু পবিত্র 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' ধ্বনির সমবেত মৃদু উচ্চারণ। রাতের অন্ধকারকে সাক্ষী রেখে পুণ্য চিতাগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হোল। সমবেত কণ্ঠের গান উঠলো বেজে, 'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম'।

একদিন এক সমাজসেবায় আগ্রহী ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "স্বামীজীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসার চেষ্টা করো, দেখবে তোমার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" প্রত্যয়ী যৌবনের প্রারম্ভে একদিন রামবাগান বস্তির কাজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, "এই যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষগুলির চোখের দৃষ্টিতে, তাদের আশা-আকাঙ্খায় প্রকাশিত চৈতন্য-সত্তাকে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সভ্য নামধারী যে কোন সমাজকে বস্তি নামক দাগটিকে মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।" কাছে থাকা কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানেরা মাঝে মাঝেই শুনতো তাঁর বহু-উচ্চারিত একটি উক্তি, "Be sincere to yourself and to Sri Ramakrishna." বিশেষ এক জিজ্ঞাসা নিয়ে আসা এক নবীন সন্ন্যাসীকে একদিন গভীর বিশ্বাস আর ভাব নিয়ে বলেছিলেন, "ঠাকুর-মাকে ধরে থাকবে সারাজীবন, নিত্য প্রার্থনা করবে তাঁদের কৃপাকরুণা। দেখবে তাঁরা তোমার ডাক শুনবেনই। তোমার জীবনে তাঁরা আসবেনই।"

যদি কোন কালের সাধক প্রশ্ন করে 'স্বামীজীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা', 'চৈতন্য-সত্তাকে স্পষ্ট অনুভব করা', নিজের প্রতি ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এই অবিচল নিষ্ঠা, আর 'তাঁদের কৃপাকরুণা'র জন্যে 'নিত্য প্রার্থনা' – এই সমস্ত কিছু দিয়ে নির্মিত জীবনধারা কি কোনদিন এই ধরণীর মাটিকে আধ্যাত্মিকতার পাবনধারায় স্নিগ্ধ করেছে? – তাহলে সেই জিজ্ঞাসার সামনে অনিভন্ত জ্যোতিরালোকে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের যে সিদ্ধ-সাধককুলের জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তাদেরই অন্যতম পরম পূজনীয় প্রভানন্দজীর অলোক-আলোক-নন্দিত জীবন। সে জীবনের নানা মাহেন্দ্রলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর পবিত্র-উপস্থিতির দীপ্র মণীদীপ্তি যে ছড়িয়ে গেছে দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে। এমন জীবনের জন্যেই তো 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। এমন আবির্ভাবের জন্যেই যে 'বসুন্ধরা পুণ্যবতী'। এমন সিদ্ধ-সাধকদের ভাস্বর জীবনালেখ্যর দিকে তাকিয়েই তো শাস্ত্র লেখেন, "শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো / বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ / তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবাংজনা / নহেতুনাऽন্যানপি তারয়ন্তঃ।"†

---

†বসন্ত-ঋতুর মত না-চাইতে দাতা, রাগলোভাদিশূন্য, শান্ত, মহান সাধুব্যক্তিরা এ জগতে বাস করেন। তাঁরা নিজেরা সাধনবলে দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হয়ে, শরণাগত অন্য ব্যক্তিদেরও নিজেদের কোনরকম কিছু পাওয়ার আশা না রেখেই সংসার-সমুদ্রের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অবস্থান করেন। (বিবেকচূড়ামণি, ৩৭ নং শ্লোক)।